চীন ভ্রমণ

ডাক্তার শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম. এ. বি. এল

প্রণীত।

PUBLISHED BY

S. C. MAZUMDAR

20, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

CALCUTTA.

1906.

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভূমিকা।

যেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীর ও মনের অবস্থা বড়
খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সমুদ্রে থাকিয়া অনেক সুস্থ মনে
করিয়াছিলাম। যে সকল দেশ দিয়া গিয়াছি সেখানে যাহা যাহা
দেখিতাম নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতাম, পরে পড়িয়া নিজেই আনন্দ
পাইব বলিয়া।

যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, সেই সকল হইতেই
লিখিলাম। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকরূপে বঙ্গবাসীতে
প্রকাশিত হয়। পরে সাহিত্য ভারতী প্রভৃতি কাগজে আরও চীন
ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে অনেক গুলিই
এই পুস্তকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

যাহা লিখিয়াছি তাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবার
ছিল। পুস্তক বড় হইবে বলিয়া লিখিলাম না। সময়ান্তরে লিখিব।
এতগুলি দেশ দেখা অল্প দিনের কাজ নয়। অল্পদিনে যাহা সংগ্রহ
করিয়াছি যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কত
ভুল থাকিতে পারে।

পূর্ব্বেও আমি একবার ভারতবর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাহির
হইয়াছিলাম—কিন্তু এই আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। দেশ ভ্রমণ আমার
এতই ভাল লাগে যে আবার অর্থ সংগ্রহ ও সুবিধা করিতে পারিলেই
যাইব। সুধু শরীর ভাল হওয়া নহে—কত জ্ঞানলাভ হয়, কত চোখ
ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়া আমাদের ক্ষু

ভূমিকা।

যেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীর ও মনের অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সমুদ্রে থাকিয়া অনেক সুস্থ মনে করিয়াছিলাম। যে সকল দেশ দিয়া গিয়াছি সেখানে যাহা যাহা দেখিতাম নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতাম, পরে পড়িয়া নিজেই আনন্দ পাইব বলিয়া।

যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, সেই সকল হইতেই লিখিলাম। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকরূপে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। পরে সাহিত্য ভারতী প্রভৃতি কাগজে আরও চীন ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে অনেক গুলিই এই পুস্তকে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

যাহা লিখিয়াছি তাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবার ছিল। পুস্তক বড় হইবে বলিয়া লিখিলাম না। সময়ান্তরে লিখিব। এতগুলি দেশ দেখা অল্প দিনের কাজ নয়। অল্পদিনে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কত ভুল থাকিতে পারে।

পূর্ব্বেও আমি একবার ভারতবর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম—কিন্তু এই আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। দেশ ভ্রমণ আমার এতই ভাল লাগে যে আবার অর্থ সংগ্রহ ও সুবিধা করিতে পারিলেই যাইব। সুধু শরীর ভাল হওয়া নহে—কত জ্ঞানলাভ হয়, কত চোখ ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়া আমাদের ক্ষুদ্র

সংসারের সুখ দুঃখের প্রকোপ কত হ্রাস হয়, এবং চিরসঞ্চিত মনের সংকীর্ণতা কত কমিয়া যায়।

ঠিক এক বৎসর পরে পুস্তক বাহির হইল। আমার সময় না থাকায় ও এরূপ পুস্তক লিখা বা ছাপান কার্য্যে আমি একেবারে অনভ্যস্ত বলিয়া এত দেরী হইল।

এই পুস্তক ছাপান সম্বন্ধে বাবু শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদক এবং পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ—যিনি "হোমারের ইলিয়ড্" সুললিত বঙ্গভাষায় ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন, ইঁহারা দুইজনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কাগজের স্বত্বাধিকারী পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই ছবির ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি এই সকল মহাশয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

বিনম সমর বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমৎ মহারাজ
রাধাকিশোর দেব বর্ম্মমাণিক্য বাহাদুর।

মহারাজ স্নেহ পরবশ হইয়া যত্নের সহিত চীন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতেন জানিয়া এই সামান্য ভ্রমণ—বৃত্তান্ত মহারাজের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব।

চীন ভ্রমণ।

→⁂←

রেঙ্গুনের পথে

ভোর ৬টার সময় কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজখানি ছাড়িল। যাহারা আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তীর হইতে চাদর দোলাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি কখনও সমুদ্রযাত্রা করি নাই,—এই প্রথম। মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিল। তাহা ভয় নয়, দুঃখ নয়, আনন্দও নয়,—একরূপ অনিশ্চিত ভাব।

যখন জাহাজ ছাড়িল, তখন আমি কেবিনে জিনিষপত্র রাখিয়া ডেকের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। অত বড় প্রকাণ্ড জাহাজখানির গতি মোটেই বুঝা গেল না। কেবল এঞ্জিনের শব্দ ও জলের আন্দোলন হইতে বুঝা যাইতে লাগিল জাহাজ খানি চলিতেছে। হাইকোর্ট, ইডেন গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি ছাড়াইয়া জাহাজ খানি ধীরে ধীরে সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই তীর ব্যাপিয়া কত বাড়ী ও কল-কারখানা। সকলগুলিই বিদেশীয়দের ; একটীও দেশীয় লোকদের নহে।

কলিকাতা হইতে গঙ্গার মোহনা ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী। জাহাজখানি ঘণ্টায় ১৫ মাইল যায়। সুতরাং ৬ ঘণ্টায় সমুদ্রে পৌছিবার কথা। কিন্তু তা না হইয়া আমাদের "সাগর পয়েণ্ট" পৌছিতে প্রায় ৯ ঘণ্টা লাগিল। তাহার কারণ, গঙ্গার মোহনায় বিস্তর চড়া আছে বলিয়া

জাহাজ আস্তে আস্তে চালাইতে হইল। বৈকালে ডায়মণ্ডহারবারের আলোক-গৃহ (Light-house) ও কেল্লা দেখিলাম। এ সকল স্থানে নদীর মুখ অতিশয় প্রশস্ত—এক তীর হইতে অন্য তীর প্রায় দেখা যায় না। ইহার কিছু নিম্নে সাগর পয়েণ্ট। এই স্থানটী অতি ভয়ানক স্থান,—চোরাবালির চড়ায় পড়িয়া এই স্থানে বিস্তর জাহাজ মারা গিয়াছে। সেই কারণ আস্তে আস্তে, সাবধানে জাহাজ চালাইতে হয়। হাল্‌কা ক্ষুদ্র নৌকা (Life-Boat) গুলি সততই জলে নামাইবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয়। চোরাবালির চড়ায় জাহাজ লাগিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে জাহাজের আরোহীরা এই বোটে চড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে।

যে গঙ্গা-সাগরে তীর্থযাত্রীরা তীর্থ করিতে ও স্নান করিতে যায়, সেই সাগর দ্বীপ এই থানেই অবস্থিত। দ্বীপ ছাড়া তথায় এখন আর কিছুই দেখিবার নাই। ইহার পরেই সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে।

কাপ্তেনই জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার আদেশ মতই সমুদ্রে জাহাজ চালান হয় ; কিন্তু কোনও বন্দরের ভিতর তিনি জাহাজ চালাইতে পারেন না। তার জন্য আলাহিদা লোক আছে,—তাদের *"পাইলট" (Pilot)* বলে। এতক্ষণ তিনিই জাহাজ চালাইয়া আসিয়াছিলেন। এই অবধি পৌছাইয়া দিয়া, একখানি ছোট বোটে চড়িয়া পাইলট কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। সাগর-তরঙ্গে বোটখানি হেলিতে-দুলিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে বেলাভূমি রেখার মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিল, এবং পরে একেবারে অদৃশ্য হইল। তখন কালিদাসের সেই,—"আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্দ্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।" কবিতাটী মনে পড়িয়া গেল। তৎপরে আর চারি দিকে কিছুই নাই, কেবল অনন্ত নীল জলরাশি ; কেবল কতকগুলি সাদা স্থূলকায় জলচর পক্ষী জাহাজের চারি দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। উপরে মেঘমণ্ডিত আকাশ। পশ্চিম আকাশ

রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বারিধিবক্ষেও সেই আভা প্রতিফলিত হইল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। ধরণী তিমিরাবগুণ্ঠিতা হইলেন। আকাশে শত সহস্র হীরকখণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

নদীমুখ হইতে সমুদ্রে পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলের বর্ণ পরিবর্ত্তন একটি বিচিত্র দৃশ্য। ময়লা মাটির মিশ্রণে নদী জলের রঙও ময়লা পাটকিলে বর্ণ। সমুদ্র জলের রঙ ঘোর নীল বর্ণ; কিন্তু নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। নদী যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে, সে স্থানের জলের রঙ পাটকিলে ও লাল, উভয় রঙের মিশ্রণে সবুজ হইয়াছে। সমুদ্রে মিশিবার সময় নদীবেগ প্রশমিত হয় বলিয়া এই স্থানে নদীজলের যত ময়লা মাটি তলায় থিতাইয়া পড়ে ও সেই কারণে চোরাবালির চড়া প্রস্তুত হয়। সুতরাং এই সকল স্থান দিয়া জাহাজের গমনাগমন অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাগর পয়েণ্টের কাছে জাহাজ তাই সন্তর্পণে আসিল। ক্রমে পাটকিলে রঙ সবুজ হইয়া পরে নীল হইয়া গেল। এখন হইতে কেবল নীল জলরাশি।

জাহাজ দিনরাত চলে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে অনন্ত জলরাশি ভেদ করিয়া জাহাজ সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিল। এমন অনিশ্চিত স্থানে কি বিদ্যার বলে, কি সাহসে যে আপনার গন্তব্য পথ ঠিক রাখিয়া জাহাজ চোখ বুজিয়া চলে, সে কথা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

জাহাজগুলি এত বড় ও এত সুন্দর যে, এক একটা জাহাজ যেন এক একটি সহর। আমাদের জাহাজে সর্ব্বসমেত প্রায় ১২ শত লোক ছিল। সকলেরই থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা। জাহাজখানি ৩ শত ফিট লম্বা ও ৪০ ফিট চওড়া। জাহাজের পিছনে প্রথম শ্রেণী অবস্থিত। দুই ধারে দুই সার কেবিন ও মধ্যে প্রথমশ্রেণীর বৈঠকখানা (Saloon) ও ভোজনাগার (Dining room)। জাহাজের মধ্যস্থলে এঞ্জিন (Engine) ও তাহার দুই পার্শ্বে

দুই সার দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন। জাহাজের সম্মুখ দিকে কতকগুলি ছোট ছোট কেবিন আছে তথায় লস্করেরা থাকে। প্রথম শ্রেণীর কেবিনগুলির উপরে প্রথম শ্রেণীর ডেক বা পাটাতন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলির উপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক। এই গুলি যাত্রীদের আরামের স্থান। এই সকল ডেকে কাঠ ও কেম্বিস নির্ম্মিত চেয়ার পাতিয়া যাত্রীরা বসিয়া থাকে, বা পা-চালি করিয়া বেড়ায়, বা খেলা করে, গল্প করে, বা পড়ে। আহারের সময় ছাড়া সমস্ত দিনই এইখানে থাকিতে হয়। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে স্থান আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ও লস্করদের কেবিনের মধ্যে যে স্থান আছে, সেগুলি ডেকের যাত্রীদের (Deck passenger) জন্য। সকল ডেকগুলিরই কেম্বিসের ছাত আছে। ইহার নীচে আরও দুই তলা আছে,—সিঁড়ি দিয়া তথায় নামিতে হয়। তন্মধ্যে সকলের নীচের তালায় মাল বোঝাই হয়, ও তাহার উপর তালায় কতকগুলি ডেক-যাত্রী থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর কাপ্তেনের থাকিবার কেবিন আছে ও তাহার উপর (Bridge) হাল ফিরাইবার স্থান।

প্রথম শ্রেণীর প্রতি কেবিনে একটী বা দুইটী করিয়া শুইবার স্থান আছে। প্রত্যেকটী ৬ ফুট লম্বা ও ২৷৷০ ফুট চওড়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক একটী পোসিলেনের মুখ ধুইবার টব ও তাহার আনু-সঙ্গিক দ্রব্যাদি, যথা,—সাবান তোয়ালে আয়না ইত্যাদি আছে। ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। পাইখানা ও স্নানাগার অন্য স্থানে। স্নানাগারে ১০ মিনিটের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই। সকল লোকের ত সুবিধা দেখা চাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলিও ঐরূপ, তবে তাহাতে তিন চারিটী লোকের থাকিবার স্থান আছে এই মাত্র প্রভেদ। বিছানা, কম্বল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জাহাজ হইতেই দেওয়া হয়। অনেকগুলি কেবিন লইয়া এক একটী চাকর

নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাকে বয় (Boy) বলে। সে যথা সময়ে বিছানা পাতে, জুতা ঝাড়ে ও খানা জোগায়। জাহাজে নাপিত আছে; কিন্তু ধোপার ব্যবস্থা নাই। কোন বন্দরে জাহাজ থামিলে কাপড় কাচাইয়া লইতে হয়। এক দিনেই কাপড় কাচিয়া দিতে পারে; কিন্তু প্রতি কাপড় খানির জন্য দুই আনারও বেশী দিতে হয়।

প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগার পৃথক পৃথক; ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। সকাল ৯টার সময়ে প্রাতর্ভোজন (Breakfast), ১টার সময়ে জলযোগ টিফিন (Tiffin) ও সন্ধ্যা ৭টার সময়ে প্রধান ভোজন বা ডিনার (Dinner) হয়। তা'ছাড়া প্রত্যূষে ৬টার সময় ছোট হাজরী ও বৈকালে ৪টার সময় বৈকালিক বা (Afternoon Tea) দেওয়া হয়। এ দুটিতে কেবল চা ও মাখন, এবং পাউরুটীর টোষ্ট থাকে। তা ছাড়া সকল সময়েই প্রচুর মাংস দেয়। ডিম, মাছ, মুরগী, পায়রা, হাঁস, ভেড়া ইত্যাদি নানারূপ মাংস আধসিদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হয়। মাংস ও মাছ বরফের ঘরে (Ice Chamber) রক্ষিত হয়। এজন্য ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত টাটকা জিনিষের মত থাকে। তবে কতক কতক জীবিত জন্তু ও পক্ষীও রাখা হয়। ব্রেক্‌ফাষ্ট ও টীফিনে ভাতও পাওয়া যায়। তা ছাড়া অতি উপাদেয় ফল, যেখানে যা পাওয়া যায়, উক্ত খানায় ও টীফিনের সঙ্গে দিয়া থাকে। রুটী, মাখন, জ্যাম, জেলি অপর্য্যাপ্ত। তবে নিরামিযাশীর আহারের অনেকটা অসুবিধা হয়। জাহাজে বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ (Condensed Milk) ছাড়া অন্য দুধ পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিন রাত জাহাজ চলে। তখন জাহাজের লোক জন, বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উড্ডীয়মান মৎস্য সকল জাহাজের শব্দে জল হইতে উড়িয়া খানিকদূর গিয়া আবার জলে বিলীন হয়। পথে কখন

কখন অন্য জাহাজের সহিত দেখা হয়; তখন শত শত লোক উৎসুক চিত্তে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে,—যেন কি এক অদ্ভুত নূতন জিনিষ। এই সময় ডেকে বসিয়াই অধিকাংশ সময় কাটে। বসিয়া বসিয়া বিরক্তি ধরিয়া যায়। একটু চলিতে ইচ্ছা হয়। তখন কেবল মাত্র একটু এদিক ওদিক পা-চালি করা চলে। দোল্‌না আছে চলিতে পার, রক্ত সঞ্চালন একটু সতেজ হইবে। পুস্তকাগার আছে তাহা হইতেই পুস্তক লইয়া অধিক সময় কাটান যায়। সঙ্গীতের জন্য একটী ঘরে পিয়ানো (Piano) আছে, তাতেও অনেক সময় আমোদে কাটিতে পারে। কত লোক তাস খেলে, জুয়া খেলে। সকলেই সময় কাটাইবার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং লোকের সহিত আলাপ সহজেই ঘটিয়া যায়। একত্রে বসিয়া দাঁড়াইয়া অল্প দিনের ভিতর এত আলাপ হয়,—উভয়ে যেন কত দিনের, কত পুরুষের আত্মীয়তা আছে। অন্তরের কথা অবধি বিনিময় হয়। বিদায় লইবার কালে বড়ই ব্যথা লাগে। জাহাজের উচ্চ কর্ম্মচারীরাও প্রায়ই অতিশয় মিশুক ও অবসর কালে সকলের সহিত মিশিতে ও গল্প করিতে ভালবাসেন। এইরূপ নানা রকমে বেশ আনন্দে সময় কাটিয়া যায়।

তবে যদি সমুদ্রে বেশী ঢেউ হয় ও জাহাজ টলে, তাহা হইলে শরীর কেমন আন্‌চান্ করে, মাথা ঘোরে, দাঁড়াইতে কষ্ট হয় ও কাহারও কাহারও,—বিশেষ প্রথম সমুদ্রযাত্রীর বমির বেগ আসে। (Sea-sickness) সামুদ্রিক পীড়া একেই বলে। দাঁড়াইবার যো নাই, মাথা তুলিবার যো নাই, কিছু খাইবার যো নাই, অনবরত বমির বেগ। বমি হইয়া গেলে আরাম বোধ হয়, তবে প্রায়ই কেবল মাত্র বমির বেগই আসে,—বমি হয় না; অথবা যদি কিছু উঠে, তাহা অতি বিকট পিত্ত কিম্বা অম্বল। জাহাজের মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা কম দোলে.—তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর হাওয়ায় মাথা

করিয়া শুইয়া থাকিলে খুব আরাম বোধ হয়। খুব পাক দিলে যে কারণে বমি হয়, সামুদ্রিক পীড়াও সেইরূপ কারণে হইয়া থাকে। অনেকের মত, এরূপ অবস্থায় বমির বেগ সত্ত্বেও আহার করা উচিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, গরম জল পান করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া প্রথম বমি করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য ; তাহাতে বিকৃত পিত্ত ও অম্ল উঠিয়া গেলে শরীর শীঘ্র সুস্থ হয়। সামুদ্রিকপীড়া কাটিয়া যাওয়ার পর ক্ষুধা ও হজম আরও ভাল হয়, এবং শরীর আরও সুস্থ ও সবল হয়।

অনেক প্রকার যাত্রীরসহিত একত্রে থাকিতাম; তার মধ্যে কতকগুলির কথা বিশেষ করিয়া বলি। আমাদের সঙ্গে একটি জার্ম্মাণবালিকা ছিলেন, তিনি তাঁহার বিধবা মায়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। তাঁহার পিতার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। অথচ তাঁহাদের কাহাকেও তত বিষণ্ণ দেখিলাম না। তিনি অহরহ সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর হইতেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সেও তাঁহার বালিকা সুলভ চপলতা যায় নাই। সুস্থ, সবল শরীরে ও মনের আনন্দে সারাদিন তিনি জাহাজের এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু যাই জাহাজ একটু দুলিত, অমনি তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন,—উঠিবার বা খাইবার শক্তি থাকিত না।

একটি চীনে বালক ছিল সে কলিকাতার ডভেটন কলেজের ছাত্র। তার পিতা চীনেম্যান এবং মাতা ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রীলোক। তাহাকে দেখিয়া সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে বলিয়া মনে হইল। বাড়ী যাইবার আনন্দে সে সারাপথই উৎফুল্ল। কিন্তু সেও ঐরূপ জাহাজ দুলিলেই কাতর হইয়া পড়িত। নয়ত সারা দিন একটি ছোট বাঁশী বাজাইয়া দিন কাটাইত। তাহার বাঁশী বাজানর শিক্ষাও অতি আশ্চর্য্য। এঞ্জিনের শব্দ ভেদ করিয়া অতি সুমধুর স্বরে সে যখন চীনে গানের, বর্ম্মা গানের, ইংরাজী গানের রাগ-রাগিণী আলাপ করিত, তখন

জাহাজের কর্ম্মচারীরা ও যাত্রীরা মুগ্ধ হইয়া তাহার সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে থাকিত।

আর ছিল,—একটি অনাথ ইংরেজ বালক। তাহার ১৭ বৎসর মাত্র বয়স। তাহার বিধবা মাতাকে যিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পিতা তাহার মায়ের মৃত্যুর পরই ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই থেকে বালক টেলিগ্রামের কাজ করে। এত দিনে সে স্বচ্ছল পয়সার মুখ দেখিতেছে। অল্প বয়স হইতেই আপনার পথ দেখিতে হইতেছে বলিয়া তার প্রতিকার্য্যে স্বাধীনতা ও সুবিবেচনার ভাব দেখিলাম। নিজের যৎসামান্য দ্রব্যাদি লইয়া সে আন্দামান দ্বীপে তারহীন টেলিগ্রাফের (Wireless Telegraphy) তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ খালাসী জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নেমাজ পড়িতেছিল। কাজ হ'তে ক্ষণেক ছুটি পেয়ে যখন সে পশ্চিম আকাশের দিকে কালিঝুলি মাথা মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে স্তুতি গানগুলি উচ্চারণ কর্‌ছিল, তার প্রতি স্বর, প্রতি মুখভঙ্গি ও অঙ্গ বিক্ষেপে এক পবিত্র তন্ময় ভাব উথ্‌লে পড়্‌ছিল।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে, পথে (Bessin) বেসিনের আলোক-গৃহ দেখিলাম। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর আলোকটি দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে। একবার পূর্ণ দীপ্তিমান, এক একবার ক্ষীণপ্রভ। অন্য সকল আলো হইতে প্রভেদ জানাইবার জন্য আলোক-গৃহের আলো এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জ্বলে। যেন পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে দাঁড়াইয়া পথিককে পথ দেখাইতেছে।

নিকটবর্ত্তী তীরভূমি বা পাহাড় হইতে সাবধান হইবার জন্য ও গন্তব্য পথ দেখাইবার জন্য যেরূপ আলোক-গৃহ থাকে, নিমজ্জিত চূড়া হইতে সাবধান করিবার জন্যও তদ্রূপ আলোক-জাহাজ (Light

Ship) থাকে। একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ মাঝ সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া তাহার উচ্চ মাস্তুলে আলো জ্বালে। পথে এইরূপ আলোক-জাহাজও অনেক জায়গায় দেখা যায়।

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় এলিফেণ্ট পয়েণ্টের (Elephant Point) আলোক-গৃহ দেখা গেল। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ৭৬০ মাইল হইবে। আমাদের জাহাজ-খানি মেল অর্থাৎ ডাক লইয়া আসিতেছে, তাই অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আসিয়া পৌছিল। অন্য ষ্টীমারে পৌছিতে আরও এক দিন দেরি হয়।

সকল স্থানেই জমির সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা বেলাভূমি দেখিতে পাইবার বহু পূর্ব্বে জমি যে নিকটে আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। সমুদ্রজলের ঘোর নীল রঙ সবুজ হইয়া উঠে। জমির দ্রব্যাদি ও গাছপালা জলে ভাসিতে দেখা যায়। নদীতে বিচরণকারী পাখী সকল উড়িয়া আসিয়া চারি দিকে বেড়ায়।

সন্ধ্যার সময় আমরা ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করিলাম। জাহাজের মাস্তুলে রাজার ডাকের (Royal Mail) নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইল। নদীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় জাহাজ বাশী বাজাইয়া হুঙ্কার করিল। সকলেরই মনে আনন্দ হইল। নূতন দেশের নূতন হাওয়া আমাদের গায়ে লাগিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় তৃতীয়ার চাঁদ শুকতারার সঙ্গে লাল সন্ধ্যাকাশে দেখা দিল। বৃহস্পতিও উদয়োন্মুখ। অগণ্য তারাদল ইরাবতীবক্ষে ও ব্রহ্মদেশের সমতল-ভূমির উপর উদয় হইল।

ওই ব্রহ্মদেশ ও এই ইরাবতী নদী ভারতবর্ষেরই পাশে, সংস্কৃত নামে অভিহিত। গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত "সর্ব্বজীবে দয়াধর্ম্ম" এখানেও প্রচলিত। ইঁহারা আমাদের প্রতিবাসী ও কত নিকট আত্মীয়।

তাই আমাদের আসতে দেখে কতকগুলি সাদা সাদা সুস্থকায় পক্ষী মধুর স্বরে ডাকতে ডাকতে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে আমাদের যেন সম্ভাষণ করতে এলো। অমন সুস্থ শরীর,—এমন উন্মুক্ত স্থানে না থাকলে হয় না। স্বরও কি তেমনি আনন্দ-ব্যঞ্জক! যেন ব'লছিল, "আয় পথিক! আয় বিদেশী!—আয় তোরা, আমাদেরই আপনার লোক। এ তোদেরই ঘর-বাড়ি। পথশ্রমে কাতর হ'য়েছিস্। মুখ হাত পা ধো। পর ভেবে যেন সঙ্কুচিত হোসনে।"

খানিক অগ্রসর হইয়া জাহাজ নঙ্গর করিল। কলের তরীখানি ইরাবতীর স্রোতে দুলিতে লাগিল। একটী বাঙ্গালী বাবু চাকরী উপলক্ষে রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। তিনি পুলকে গলা ছাড়িয়া সুকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

"জলধি র'য়েছে স্থির,
ধূ-ধূ করে সিন্ধু-তীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।"

রেঙ্গুন।

ইরাবতীর পাইলট আসিয়া রাত্রেই জাহাজে ছিল। ভোর ৫টার সময় জাহাজ ছাড়িল, তখন পূর্ব্বদিক লাল হইয়া আসিতেছে মাত্র। একটু পরেই আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল। দুই ধারে শস্যশ্যামলা তীর-ভূমি দেখা গেল। যতদূর চক্ষু যায়, কেবল সবুজ রঙ বই আর কিছু নাই। ভূমি এত উর্ব্বরা ও ধান এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে, প্রতি-বৎসর এক লোয়ার বর্ম্মা হইতেই মালয়, চীন ও জাপান, এমন কি ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি বহু স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল রপ্তানি হয়। মোট সাড়ে তের কোটী টাকারও অধিক চাউল বিদেশে যায়।

অল্পক্ষণ পরেই রেঙ্গুন বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। অতি সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাড়ী সকল দেখা যাইতে লাগিল। দুই পাশেই বড় বড় কল-কারখানা ও উচ্চ উচ্চ সোণালী রংয়ের বৌদ্ধ-মন্দির-চূড়া (Pagoda) সকল গগনস্পর্শী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অসংখ্য অর্ণব-পোত ও "সামপান" নামক দেশী নৌকা ইরাবতীর স্রোতে ভাসিতেছে।

কলিকাতা হইতে জাহাজ আসিলেই প্লেগের জন্য এখানে বড় কড়া পরীক্ষা করে। পাছে প্লেগ আক্রান্ত রোগী বা প্লেগ বিষে দূষিত দ্রব্যাদির সংস্পর্শে রেঙ্গুনে প্লেগ রোগ প্রবেশ করে, তাহার জন্য সাবধান হওয়াই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। কোনও লোকের উপর সন্দেহ হইলে, তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া (Inspection Camp) পরীক্ষা-তাঁবুতে রাখা হয়। তাহার ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়গুলি ধোঁয়া.

দিয়া (Vapour bath) শোধিত করা হয়। এই জন্য যাত্রীদের প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা আটক থাকিতে হয়।

এই স্থানে আমি এ জাহাজ ছাড়িয়া চীন যাইবার জাহাজে চড়িলাম, ও তাহাতে আমার জিনিষ পত্র রাখিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম।
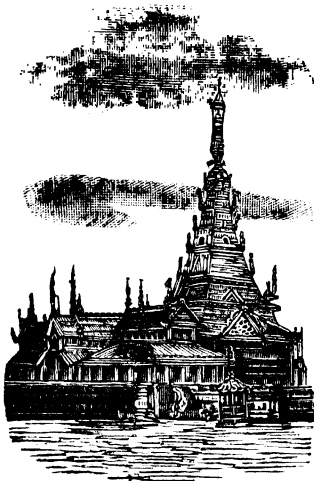
"প্যাগোডা" বা বৌদ্ধ-মঠ।

জাহাজ হইতে তীরে নামিতে হইলে সামপানে করিয়া নামিতে হয়। ঐ নৌকাগুলি ছোট ও হাল্‌কা এবং দেখিতে অতি সুন্দর। একজন মাঝি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুইটী দাঁড় টানে। ইহাতে হালের আবশ্যক হয় না। দেখিলাম, সকল নৌকা গুলিরই মাঝি চট্টগ্রামের মুসলমান লস্কর। একটিতেও ব্রহ্মদেশীয় মাঝি নাই।

তীরে নামিয়া দেখি, জাহাজ হইতে যে সব লোক জিনিষপত্র নামাইতেছে ও উঠাইতেছে, তাহারা সকলেই মাদ্রাজ দেশীয়। তাহাদের মধ্যে একজনও ব্রহ্ম দেশীয় লোক নহে। ঘোড় গাড়ীতে উঠিতে গিয়া

দেখি,—সব গাড়োয়ানই উত্তর-পশ্চিম দেশের মুসলমান। রাস্তায় দেখি, যত পাহারাওলা সবই শিখজাতীয় ; কেহই মগজাতীয় নহে। দুই ধারের দোকানে দেখি, সব দোকানদারই হয় সুরাটী মুসলমান, নয় ইহুদী, নয় পার্শী, নয় চীনে, নয় সাহেব, বর্ম্মান এক জনও নহে। বাজারের ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট দোকানে বসিয়া নানা রঙের লুঙ্গী পরিয়া ও মুখে ঘন করিয়া "তা-না-খা" অর্থাৎ চন্দনকাঠের গুঁড়া মাখিয়া সুস্থ শরীরে হৃষ্টচিত্তে কেনা বেচা করিতেছে।

এই সকল দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সবইত দেখিলাম ভিন্ন দেশীয় লোক—চাটগাঁয়ের লস্কর, মাদ্রাজী কুলী, পশ্চিমে গাড়োয়ান, শিখ পাহারাওয়ালা, সুরাটী, ইহুদী, পার্শী ও চীনে ব্যবসাদার। এখানকার আদত ব্রহ্মদেশী লোক গেল কোথায়? স্ত্রীলোকেরা দোকান করিতেছে দেখিলাম ; কিন্তু পুরুষেরা কোথায়? অনেকক্ষণ আমি এ সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

রাস্তায় যে সকল ব্রহ্মবাসী পুরুষ দেখিলাম, তাদের ভিতর যেন প্রাণ নাই। দেহ তেজোহীন,—স্বাস্থ্যশূন্য। তাহাদিগকে দেখিয়া উৎসাহহীন, ভগ্নোদ্যম, ম্রিয়মান বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে দুই একজন ব্রহ্ম যুবক টক্‌টকে রঙের লুঙ্গী পরিয়া, মাথায় রেসমের চাদর বাঁধিয়া,সতেজে (Bicycle) বাইসাইকেল চড়িয়া যাইতেছিল বটে, অথবা কোন ধনী ব্রহ্মদেশীয় লোক সুসজ্জিত ব্রহ্মবাসিনী স্ত্রীলোকের সহিত ব্রুহাম গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে গেল বটে, কিন্তু অধিকাংশ বর্ম্মানকেই যেন ক্ষীণজীবী ম্রিয়মান বলিয়া মনে হইল। ইহার কারণ কি?

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকের প্রভুত্ব অত্যধিক। তাঁহারাই বাহিরের কাজ কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন, দোকান রাখেন ও কেনা-বেচা করেন। তাঁহারা অল্প কারণেই (Divorce) বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন।

বাহিরের কাজ কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের শরীরও পুরুষ অপেক্ষা অনেক সুস্থ ও কর্ম্মঠ। ব্রহ্মের অনেক আফিঙ সেবী অলস পুরুষ ঘরে বসিয়া থাকেন—কতক কতক গৃহকর্ম্ম করেন—রাঁধেন, ঘর ঝাঁট দেন। তাঁহারা রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির ছাট সহিতে পারেন না। বাহিরে আসা কাজের ভিতর কেবল স্ত্রীর খাবারটি দোকানে পৌছাইয়া দেওয়া। নিম্ন ব্রহ্মের ক্ষেত্র এমন উর্ব্বর যে, জমিতে আঁচড় দিয়া বীজ ছড়াইলে অনায়াসে ষোল আনা ফসল হয়। সে কাজেও তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে মাদ্রাজী কুলীর সাহায্য লন। এরূপ কোণের ভিতর থাকা ও অলস অভ্যাসের দোষেই তাহাদের শরীর তত সবল ও হৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম দেশীয় স্ত্রীলোকদের গোলগাল সুগঠিত দেহ পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশের জমির অত্যধিক উর্ব্বরতাই ব্রহ্মদেশীয় পুরুষকে এত অসল ও শক্তিহীন করিয়াছে। চীন দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। যেমন অনুর্ব্বরা ভূমি, মানুষের পরিশ্রমশক্তিও সেখানে তত অধিক। রেঙ্গুনে বিস্তর চীনে-ম্যানের বাস। তাহারা সকলেই ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপৃত। (China Lane) চীনাগলির পশ্চিম দিকের সমস্ত অংশ চীনেম্যানের বসতি। অনেকে ব্রহ্ম দেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করে। এইরূপে অনেক চীন ও ব্রহ্ম মিশ্রিত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। চীনেম্যান যেথানেই যায়, সেই থানেই এই নীতি অবলম্বন এবং এইরূপ বর্ণশঙ্কর জাতি উৎপন্ন করে। কলিকাতাতেও অনেকে এইরূপ করিয়াছে।

রেঙ্গুন নূতন সহর; তাই আয়তনে ছোট ও এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি সব সোজা সোজা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মার্কিণের ন্যায় নম্বর দিয়া পথের নামকরণ হইয়াছে; যথা ১৬শ ষ্ট্রীট, ৩৫শ ষ্ট্রীট, ইত্যাদি তবে জলকষ্ট প্রযুক্ত রাস্তাগুলিতে ভাল করিয়া জল দেওয়া হয় না বলিয়া কোনও কোনও স্থানে বড় ধুলা হয়। ইরাবতীর জল লোণা

সেই কারণে রেঙ্গুনে পানীয় জলের বড়ই কষ্ট। যেথানে-সেথানে এক একটী প্যাগোডা বা বুদ্ধদেবের মন্দির আছে। অনেক রাস্তার নাম সেই সকল স্থানের প্যাগোডার নামে হইয়াছে। রেঙ্গুনে প্রধানতঃ দুইটি দেখবার জিনিষ আছে;—পশ্চিম রেঙ্গুনের দিকে প্রধান প্যাগোডা ও পূর্ব্ব রেঙ্গুনের দিকে লেক পার্ক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রেঙ্গুন সমতল ভূমি; তবে নদীর ধার হইতে জমি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। প্রধান প্যাগোডা (Grand Pagoda) এইরূপ একটি পাহাড়ে অবস্থিত। পাহাড়টী প্রায় পাঁচ শত ফিট উচ্চ হইবে। নদীর ধার হইতে সেখান পর্য্যন্ত এঞ্জিনের ট্রাম চলে। শত শত যাত্রী অহরহ তথায় উপাসনার জন্য গিয়া থাকে। আমিও অনেকবার সে প্যাগোডাটী দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ দৃশ্যটী আমার বড়ই ভাল লাগিত।

নিম্ন হইতে স্তরে স্তরে চওড়া পাহাড়ের সিঁড়ি উঠিয়াছে। তাহার উপর বরাবর খিলান করা ছাত। তাহাতে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। দুই পাশে যাত্রিদের বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন আছে ও তথায় ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পূজার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার বেচিতেছে। ধূপ, ধুনা, বাতি, চুরুট, ফুল, ধ্বজা ইত্যাদি। কেহ বা আয়না সামনে করিয়া চুল আঁচড়াইতেছে। কেহবা মুখে চন্দন কাঠের পাউডার মাখিতেছে। কেহ বা সেই খানেই বসিয়া পরিতোষের সহিত অন্ন সেবা করিতেছে। মন্দিরে উঠিতে উঠিতে পায়ে ব্যথা হইয়া যায়। উঠিয়াই সম্মুখে একটী বিস্তীর্ণ উচ্চ পরিখাবেষ্টিত বাঁধান উঠান। তাহার মধ্যদেশে সেই প্যাগোডাটী স্বর্ণচূড়া বিস্তার করিয়া রেঙ্গুনের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মন্দিরের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলি মূর্ত্তি ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ।

বাহিরে একটী ধ্যানস্থ মূর্ত্তি উপবিষ্ট; ঐ মূর্ত্তিটী প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। সাদা মান্দালেমার্ব্বেলে খোদিত, বস্ত্র ও উত্তরীয়ের পাড়গুলি সোণালী রঙের। ধ্যানে গভীর চিন্তা-শীলতা ব্যক্ত। যেন মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ অবধি জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ স্মরণে ব্যথিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে, সে জীবনের পুণ্য-কথা স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়। মন্দিরের সর্ব্বত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জুতা পরিয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই। তবে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা জুতা হাতে করিয়া লইয়া যায়। শত শত যাত্রীরা উপা-সনায় রত দেখি-

"ফুঙ্গী" বা বৌদ্ধ পুরোহিত

লাম। মুণ্ডিত মস্তক হল্‌দে পোষাক পরা "ফুঙ্গী" বা পুরোহিতগণ চারি

দিকে বিচরণ করিতেছেন,—কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন। মন্দিরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে,—বিলাতী চর্ব্বির বাতিও জ্বলে। ধূপধূনার সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। সম্মুখে ফুলের তোড়া সাজান রহিয়াছে। কাঁসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদ্য-যন্ত্র নাই। জানু পাতিয়া বসিয়া যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিতেছে। অস্ফুটস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ চীৎকার বা গোলমাল নাই। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে কেহ বা দেবপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। পূজার উপকরণের মধ্যে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য নাই।

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ সমস্বরে স্তোত্র গান করিতেছে। কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একরূপ যন্ত্রে কাটি দিয়া বাজাইতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাজাইয়া তাল রাখিতেছে। কেহ বা সারিঙ্গার মত একরূপ যন্ত্র বাজাইয়া সেই স্তুতি-গানের সহিত সুর দিতেছে। অন্ধ গায়কগুলির মুখের ভাবে যেন তন্ময়ত্ব মাখান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে। ইচ্ছা হয় পয়সা দাও,—পুরোহিতের জবরদস্তী বা ভিখারীর উৎপাত নাই। আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দিরটী দেখিয়াছি।

মন্দিরের উপর হইতে রেঙ্গুনের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। একদিকে সহর ও দূরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ-লতা-সমাবৃত অসমতল পল্লীগ্রামের সুচারু দৃশ্য। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত করিয়া যখন সূর্য্যদেব অস্ত যান, এখান হইতে সে দৃশ্য তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারিণীগণ মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধূলায় জানু পাতিয়া বসিয়া উপসনা করেন এবং নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে

বাহিরে একটী ধ্যানস্থ মূর্ত্তি উপবিষ্ট; ঐ মূর্ত্তিটী প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। সাদা মান্দালেমার্ব্বেলে খোদিত, বস্ত্র ও উত্তরীয়ের পাড়গুলি সোণালী রঙের। ধ্যানে গভীর চিন্তা-শীলতা ব্যক্ত। যেন মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ অবধি জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ স্মরণে ব্যথিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে, সে জীবনের পুণ্য-কথা স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়। মন্দিরের সর্ব্বত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জুতা পরিয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই। তবে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা জুতা হাতে করিয়া লইয়া যায়। শত শত যাত্রীরা উপাসনায় রত দেখিলাম। মুণ্ডিত মস্তক হলদে পোষাক পরা "ফুঙ্গী" বা পুরোহিতগণ চারি

"ফুঙ্গী" বা বৌদ্ধ পুরোহিত

দিকে বিচরণ করিতেছেন,—কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন। মন্দিরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে,—বিলাতী চর্ব্বির বাতিও জ্বলে। ধূপধূনার সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। সম্মুখে ফুলের তোড়া সাজান রহিয়াছে। কাঁসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদ্য-যন্ত্র নাই। জানু পাতিয়া বসিয়া যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিতেছে। অস্ফুটস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ চীৎকার বা গোলমাল নাই। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে কেহ বা দেবপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। পূজার উপকরণের মধ্যে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য নাই।

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ সমস্বরে স্তোত্র গান করিতেছে। কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একরূপ যন্ত্রে কাটি দিয়া বাজাইতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাজাইয়া তাল রাখিতেছে। কেহ বা সারিঙ্গার মত একরূপ যন্ত্র বাজাইয়া সেই স্তুতি-গানের সহিত সুর দিতেছে। অন্ধ গায়কগুলির মুখের ভাবে যেন তন্ময়ত্ব মাখান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে। ইচ্ছা হয় পয়সা দাও,—পুরোহিতের জবরদস্তী বা ভিখারীর উৎপাত নাই। আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দিরটী দেখিয়াছি।

মন্দিরের উপর হইতে রেঙ্গুনের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। একদিকে সহর ও দূরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ-লতা-সমাবৃত অসমতল পল্লীগ্রামের সুচারু দৃশ্য। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত করিয়া যখন সূর্য্যদেব অস্ত যান, এখান হইতে সে দৃশ্য তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারিণীগণ মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধূলায় জানু পাতিয়া বসিয়া উপসনা করেন এবং নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে

পানীয় জলের অভাব বলিয়া তাঁহারা শ্রান্ত পথিককে জল পান করিতে দেন।

এক দিকে যেমন পাহাড়ের উপর প্রধান প্যাগোডা অবস্থিত, অপর-দিকে তেমনি, কতকগুলি ছোট পাহাড়ের জল নিকাশের পথ বন্ধ করিয়া একটী হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটীই রেঙ্গুনের (Lake Park) "লেক পার্ক" নামে অভিহিত। ইহা সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে। সেই স্থানে যাইবার পথেই ধনী ইউরোপীয়ানদের বসতিস্থান বা বাগানবাড়ী। কাঠের ছোট ছোট বাঙ্গালাগুলি অতি সুন্দরভাবে গঠিত। নীচের তলা একেবারে খোলা। জমি স্যাঁৎসেঁতে বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা। চূড়াগুলি নানারূপ কারুকার্য্য খচিত। বাহির হইতে ঠিক যেন ছবিখানির মত দেখায়। তাহার চারিপাশে নানা-জাতীয় ফুলগাছ ও বাগান।

ব্রহ্মবাসীর বাসগৃহ।

বাগানের ভিতর-কার পাহাড়গুলি খুব ছোট ছোট। হ্রদটী নানা ধরণে আঁকাবাঁকা। পাহাড়গুলির নীচে দিয়া সুরকির পথ। পাহাড়গুলির গায়ে ঘন সবুজ ঘাস সমান করিয়া ছাঁটা। যেখানে সেখানে বেশী গাছপালা নাই। একটী পাহাড়ের উপর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত [illegible] সিঁড়ি নামিয়াছে ; জলের ধারে,

গাছের নীচে অনেকগুলি কাষ্ঠাসনও আছে। সেখানে বসিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিলে মনে বিমল আনন্দ হয়। আমার কত পুরান কথা মনে পড়িতে লাগিল। মাথার উপর গাছের ডালে অতি করুণস্বরে—অতি মিষ্টভাষায় কাকগুলি কোলাহল করিতেছিল। আমাদের এদেশের মত রেঙ্গুনের কাক কর্কশকণ্ঠ নয়।

সেই মঞ্চে বসিয়া অনেকগুলি ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভাত কিনিয়া খাইতেছিল। এখানে রাঁধা ভাত বেচে ও সকলেই তাহা কিনিয়া খায়। কি ব্রহ্মদেশে, কি মালয়দেশে, কি চীনরাজ্যে, কি জাপানে—লোকেদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। যব ও গমের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের বড়ই কম। দুধ তারা মোটেই পছন্দ করে না।

কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজে অনেক চটের থলে (Gunny Bag) ও তামাকের পাতা গিয়াছিল। বর্ম্মাচুরট প্রস্তুত করিবার জন্য তামাকের পাতাগুলি এখানে নামাইয়া দেওয়া হইল। চটের থ'লেগুলিও বন্দরে নামান হইল। জাহাজে রাশি রাশি চাউল বোঝাই হইল। মালয় ও চীনে এই সকল চাউল আমদানি হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে সাড়ে তেরকোটী টাকারও বেশী মূল্যের চাউল এসিয়ার বিভিন্ন দেশে, ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হয়। চাউলগুলি মোটা। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই চাউল হইতে কাপড়ের মাড় ও মদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু মালয় ও চীনদেশের ইহাই খাদ্য। ব্রহ্মের আর একটী প্রধান রপ্তানীদ্রব্য,—বাহাদুরী কাঠ (Timber)। উত্তর ব্রহ্মে স্বর্ণ ও হীরার খনি আছে। কেরোসিন তৈলের মত এক প্রকার তেলও (Burma oil) এখানে পাওয়া যায়। দেশে এত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সত্বেও ব্রহ্মদেশ যে দরিদ্র তাহার প্রধান কারণ, ব্রহ্মবাসী পুরুষদের দারুণ আলস্য এবং বিবেচনা না করিয়া আমোদ প্রমোদে অযথা অর্থ ব্যয়। এ সকল বিষয় পর প্রবন্ধে বলিব।

ব্রহ্মদেশ।

ইতিহাস ও সামাজিক রীতি-নীতি।

ইতিহাস পড়িয়া দেখা যায়, প্রায় সকল পুরাতন দেশের অধিবাসী-দেরই ধারণা যে, তাহারা দেবতা হইতে উৎপন্ন, আর তাহাদের দেশের রাজবংশ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত। জাপানীদের এইরূপ বিশ্বাস,—পুরাকালে দুই দেবযোনি—ভাই-ভগিনী—স্বর্গ হইতে সেতুপথে জলময়ী পৃথিবীর জলকল্লোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া জলে পড়িল, আর জাপান দ্বীপ সৃষ্ট হইল। সেই দ্বীপে ভাই-ভগিনী স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রহিয়া গেলেন। ইহা হইতেই জাপানের রাজ-বংশের আরম্ভ। চীনেদেরও কতকটা এইরূপ ধারণা। সে কথা চীন প্রবন্ধে বলিব। কিন্তু ব্রহ্মদেশের রাজবংশের উৎপত্তি এরূপ দেবযোনি হইতে নহে। তাহাদের শাক্যবংশ ও শাক্যসিংহ লইয়াই সব।

বুদ্ধদেব জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা আসিয়া ব্রহ্মদেশে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে বুদ্ধদেবের পাঁচগাছি চুল লইয়াই রেঙ্গুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতানুসারে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মা হইতেই তাহারা সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করে। তাই তাহারা নিজেরা ও 'ব্রহ্মা' বা 'বর্ম্মা' নাম লইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের লোক বুদ্ধগতপ্রাণ। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত,—তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের মহা তীর্থধাম। অনেকে বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসে। রেঙ্গুনের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছি, তাহা বুদ্ধদেবের

যাইয়া তপস্যারত বুদ্ধের নিকট হইতে ঐ পাঁচগাছি চুল চাহিয়া আনিয়াছিল। ঐ মন্দির-গঠন হইতেই রেঙ্গুনের উৎপত্তি। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ‘আলাম্প্রা’ নামক এক জন রাজা রেঙ্গুনের আসল ভিত্তি স্থাপন করেন।

আলাম্প্রা এক জন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে শিকার করিয়া তিনি জীবনযাপন করিতেন, পরে অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেন; যেখানে অভিযান করেন, সেই খানেই জয়ী হয়েন। তখন ব্রহ্মদেশ ছোট ছোট নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেখানকার রাজারা সর্ব্বদাই পরস্পর কলহ করিতেন। ক্রমে পেগু, আরাকাণ, টেনিসেরিম্--সবগুলিই তিনি জয় করিলেন; শেষে শ্যামেও যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তথাকার রাজধানী তাঁহার হস্তগত হইলে, সেই স্থানেই তিনি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই আলাম্প্রা হইতেই বর্ম্মার শেষ রাজবংশের সূত্রপাত। এ সব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক; অর্থাৎ,—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

তখন আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য বর্ম্মা রাজ্যেরই ক্ষমতাধীন ছিল। বর্ম্মার রাজগণ এই পথ দিয়া আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্য লুঠ-তরাজ করিতেন, নিষেধ করিলে কর্ণপাতও করিতেন না। এই সূত্রেই প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধ ঘটে। ক্যাম্বেল সাহেব সসৈন্যে ইরাবতীর ভিতর প্রবেশ করেন। একটিমাত্র তোপের আওয়াজেই রেঙ্গুন অধিকৃত হয়। সেখানকার কেল্লাগুলি শেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত ও চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্য্যে খচিত। ভঙ্গুর হইলেও দেখিতে অতি পরিপাটী ছিল। রেঙ্গুন অধিকার করিয়া তিনি চারি দিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্প আয়াসেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মরাজ আমেরিকান্ পাদরী জড্সন্‌কে সন্ধির

প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। এই পাদরী সাহেবের কথা পরে বলিব। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্দাবু বা যান্দাবু নগরে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংরাজ আরাকাণ, টেনিসেরিম ও আসাম দখল করিলেন, এবং যুদ্ধের খেসারত স্বরূপ এক কোটি টাকা পাওনা ধার্য্য করিলেন। এই অবধিই রেঙ্গুন ইংরাজের করতলগত রহিল।

ইহার অল্পদিন পরেই লর্ড ড্যাল্‌হাউসীর আমলে দ্বিতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ইংরাজ বণিকদের উপর ব্রহ্মরাজ অত্যাচার করিয়াছেন,—ইহাই যুদ্ধের করণ। এবারও প্রায় বিনা যুদ্ধেই নিম্ন ব্রহ্ম বা পেগু ইংরাজ দখল করিয়া লইলেন।

আবার ইহার কিছু দিন পরে, লর্ড ডফ্‌রিণের সময়ে তৃতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ ঘটে। সেই হইতেই বর্ম্মার স্বাধীনতা একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। আমার সে সকল ঘটনা বেশ মনে আছে—তখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছি। রাজা মণ্ডলমীনে মরিলে তাঁহার ছেলে থীব রাজা হন। জারজ বলিয়া অনেকে তাঁহার সিংহাসন-অধিকারে আপত্তি করেন। থীব ইংরাজী জানিতেন, এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যের প্রধানা রাজ্ঞী, তাঁহার কন্যা 'সুপেয়ালাটে'র সহিত থীবর বিবাহ দিয়া, তাঁহাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। শুনা যায়, রাজ্যারোহণ করিয়াই বিদ্রোহের ভয়ে থীব রাজবংশের ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি অনেক আত্মীয়-স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। সকল অসভ্য দেশেই ওরূপ হয়; দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবও ওরূপ করিয়াছিলেন। কিছু দিন রাজত্ব করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে, শেগুন-কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী 'বর্ম্মা-বম্বে ট্রেডিং কোম্পানী'র উপর থীব অত্যাচার করিয়াছেন। ট্রান্সভালে উইট্‌ল্যাণ্ডারদের উপর অযথা ব্যবহার উপলক্ষ করিয়াই বুয়র্ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পরে আবার এক যে, থীব ফরাসী জাতির সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবার

চেষ্টা করিতেছেন। রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, এই অছিলাতেই তিব্বত-অভিযানের আবশ্যক হইল। এইরূপ নিত্য

ব্রহ্মরাজ "থীব" ও তাঁহার মহিষী "সুপেয়ালাট"।

নিত্যই ইংরাজের পক্ষ হইতে নূতন নূতন দোষারোপ হইতে লাগিল।

তখন উত্তর-বর্ম্মায় নূতন আবিষ্কৃত হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক ইংরাজ-বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। র্যাণ্ড এবং কিম্বার্লির স্বর্ণ ও হীরকখনির লোভই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্র বিলুপ্ত করিবার প্রধান কারণ। দেশ লইব ইচ্ছা করিলে, কারণের আর অভাব হয় না। এই সকল সত্য মিথ্যা নানা কারণে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ বর্ম্মা-যুদ্ধ ঘটে। রেঙ্গুন দখল করিতে একটী তোপের আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, মান্দালেতে তাহাও আবশ্যক হয় নাই। বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন সতর জন মাত্র পাঠান সৈন্যই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ইংরাজ-সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্রই বর্ম্মা জয় হইল। থীব ও তাঁহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে পাঠান হইল। ইংরাজগণ সমস্ত বর্ম্মা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরিবারের অর্থাভাবে যার-পর-নাই দুরবস্থা হইতেছে।

তারপর হইতেই ব্রহ্মদেশের শুভাশুভ ইংরাজের হস্তেই ন্যস্ত। ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। প্রথম প্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ব্রহ্মের শাসনব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থ যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হওয়াতে, তাহা আর দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

বর্ম্মা ইংরাজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি কখনও বর্ম্মা জয় করেন নাই। তাহা হইলে বর্ম্মাতেও ভারতবর্ষের মত অবরোধপ্রথা নিশ্চয়ই প্রচলিত হইত। মুসলমান-বিজয় কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে এই বর্ম্মা ছাড়াইয়া মালয় উপকূলে গিয়া পড়িয়াছিল। সেই কারণেই মালয়ের অধিবাসীরা মুসলমান। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, যদিও বর্ম্মা-যুদ্ধের সময় বর্ম্মাকে নিতান্ত হীনবল দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে বর্ম্মা এতটা হীনবল ছিল না।

ভিতর দিয়া তাহারা বর্ম্মায় আসিয়া বসবাস করিয়াছে। যে সকল আদিমনিবাসীদের পরাস্ত করিয়া তাহারা বর্ম্মা দেশে বাস করে, সেরূপ অনেক জাতি এখনও বর্ম্মায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'কারণ' জাতি একটি। ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইহারা উন্নত।

বর্ম্মার পুরুষগণ অতিশয় আলস্য-পরবশ। কেবল চুরট খাইয়া, গল্প-গুজব ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই সময় কাটায়। ধান বর্ম্মার একটি প্রধান উৎপন্নদ্রব্য,—এত বড় ধানের আড়ৎ আর কোথাও নাই। প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তের কোটি টাকার ধান এখান হইতে রপ্তানী হয়। কিন্তু অনেক চাষা সুদখোর মাদ্রাজী শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক বড়ই উৎপীড়িত। অতিরিক্ত আমোদ-আহ্লাদের জন্য বেশী সুদে টাকা ধার করিয়া তাহারা বড়ই বিপন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ম্মায় প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং তাহারা বর্ম্মা-রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়াছে। শুনা যায়, ইহাতে বর্ম্মার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপত্যগণ পিতার মত পরিশ্রমী,—বর্ম্মা দেশের লোকের মত অলস নহে। কিন্তু অনেক চীনেম্যান্ দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেগুলিকে লইয়া যায়, মেয়েদের রাখিয়া যায়। মেয়েরা বর্ম্মার মত স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ হইতে চীন দেশে গিয়া সুখী হয় না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, এরূপ মেয়ের সংখ্যা এত বেশী যে, কোনও বিদেশী বর্ম্মায় যাইলে তাহারা উপপত্নী হইয়া থাকিবার জন্য দলে দলে তাহার নিকট আসিতে থাকে। বিদেশী লোক একা বর্ম্মা দেশে বেশী দিন থাকিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

বর্ম্মা দেশের লোক ভাল কারিগর। ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় বোনা হয়,—কিন্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড়

ব্যবহার করে না। যে দেশে রেশমের কাপড়ই সাধারণের পরিধেয়, সে দেশে সাজ-সজ্জায় স্পৃহা কত বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। মিহি রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়,—তার দামও অনেক। সাজ-সজ্জার বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবাড়ি যে, কাপড় একবার কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে না,—কেবল বাড়ীতেই পরিবে।

বর্ম্মা দেশে কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপাটী হয়। আমি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বড় কাঠের ও ঝুড়ির থালা ও গেলাস আনিয়াছি। এক একখানির বারো আনা মাত্র দাম। যে দেখে, সেই সুখ্যাতি করে,—সেগুলি এত সুন্দর।

বর্ম্মাবাসীর বিবাহ-প্রথা আমাদের বিবাহ-প্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাল্য-বিবাহের তো নামগন্ধও নাই। ওসব অঞ্চলের কোনও দেশেই সমাজের দারুণ অনিষ্টকর বাল্য-বিবাহ-প্রথা নাই। দিন-ক্ষণ দেখিবার ভার সর্ব্বত্রই আমাদের দেশের মত দৈবজ্ঞের উপর ন্যস্ত; তবে বর-ক'নেই পরস্পরকে বাছিয়া লইয়া থাকে। চীন বা জাপানে কিন্তু এরূপ প্রথা নাই। সে সকল দেশে আমাদের দেশের মত বাপ-মা যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা নাই। আমাদের দেশের মত বর্ম্মায় বর ক'নের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। চীন ও জাপানে ক'নেকে সমারোহের সহিত বরের বাড়ী যাইয়া বিবাহ করিতে হয়। বর্ম্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতই বেশী যে, বিবাহের পর জামাতাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। ধুলাপায়েই কেহ কেহ দুই তিন বৎসর থাকেন। কেহ কেহ বা শ্বশুর-বংশের উপাধি লইয়া চিরকালই পোষ্যপুত্রের মত শ্বশুর-ঘরে থাকিয়া যান। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এরূপ

এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে,—সামাজিক চুক্তিমাত্র। ইচ্ছা করিলেই চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। এ বিষয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা বর্ম্মা দেশে অত্যন্ত অধিক। শুনিয়াছি, কোনও কোনও স্থলে স্বামীর বালিসের নীচে পান-সুপারি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া যাইলেই হইল! পঞ্চায়ৎগণ বিবাহভঙ্গ-বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতাসত্ত্বেও বর্ম্মায় বহুবিবাহ যে কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা বুঝা যায় না।

বিবাহের বড় একটা বাচ বিচার নাই; যেমন সহজে হয়, তেমনি শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ দুই জনে কিছুকাল একত্রে থাকিলেই বিবাহ সাব্যস্ত হইল। স্ত্রীলোকদের যার-তার সহিত থাকা চলে। স্বদেশী বিদেশী যার সঙ্গেই থাকুক না কেন, একনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে তাহাতে সমাজে তাহাদের মর্য্যাদার কোনও হানি হয় না। চঞ্চল-স্বভাব হইলে অবশ্য আলাহিদা কথা।

ভূতে পাওয়া ও ভূত ঝাড়ানয় বিশ্বাস সকল জাতিতেই আছে। প্রসবকালে বর্ম্মা দেশের স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। কুসংস্কারপূর্ণ দেশসমূহে যেমন হইয়া থাকে, নীচশ্রেণীর দাইদের হাতে সে সব ভার ন্যস্ত। পুরুষদের ইহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের স্রোত পৌছিতে দেরি লাগে। প্রসূতিকে আঁতুড় ঘরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্য, গরমে রাখাও বটে, আবার ভূত তাড়ানও বটে! সে অসহ্য তাপে কি যন্ত্রণায় যে সময় কাটে, তা বুঝান যায় না। সাতদিন এইরূপ থাকিবার পর অষ্টম দিবসে তাহাকে 'ভেপার বাথ' অর্থাৎ গরম বাষ্পের 'ভাপরা' দিবার পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়। তাহাতে যে কত শিশু ও কত প্রসূতি মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের মত এইরূপ নীচ শ্রেণীর দাইএর প্রথা বর্ম্মায় এখনও অন্ধভাবে অনুসৃত হইতেছে।

মাছ ভাতই ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রধান খাদ্য। বর্ম্মা দেশে পচা মাছ চাট্‌নির মত ব্যবহৃত হয়; তাহাকে 'নাপ্পি' বলে। নাপ্পি বর্ম্মানেরা অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। রাঁধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। আমাদের দেশের মত রাঁধা খাদ্যদ্রব্য অস্পৃশ্য 'সকৃড়ি' বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ম্মাবাসীরা সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়া আহার করে। চীনের প্রথা,—টেবিলে বসিয়া 'চপ্‌ষ্টিক' দিয়া আহার করা। আহারান্তে ব্রহ্মবাসীর আমাদের মত হস্তমুখ প্রক্ষালন করে। আহারের সহিত পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা ওসব দেশের কোথাও নাই। সকলেই সময়ান্তরে চা খায়। দুগ্ধ-পান কেহ করে না। চুরট বা তদ্রূপ কোন না কোন দ্রব্য সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ধূমপান করে। সাধারণ যে চুরট ব্যাবহার করিতে দেখা যায়, সে চুরট খুব মোটা ও বড়। এত মোটা যে মুখে ধরিতে কষ্ট হয়। বর্ম্মা ও মালয়ের লোক পান-সুপারি খায়। আফিং-সেবন জাপান ছাড়া অল্পবিস্তর সকল দেশেই প্রচলিত।

স্ত্রীলোকের চুল রাখা সকল দেশরই প্রথা, তবে মঙ্গোলিয়ান জাতির মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে না। তাদের যেমন গোঁফ-দাড়ি প্রভৃতির স্থানে চুল বড় জন্মে না, তেমন মাথায় চুল খুব লম্বা ও সোজা হয়। পৃথিবীর আর কোন জাতিই ইহাদের মত কেশের এত পারিপাট্য করে না। ইহারা চুলের সজ্জা লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত।

বর্ম্মা দেশের পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে। তাহারা সব চুলগুলি রক্ষা করে। চীনেরা মাথার মাঝে লম্বা বিনানী রাখে মাত্র।

স্ত্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ও

চলট'লে পোষাক পছন্দ। কাপড়চোপড়েই তাহাদের সজ্জার বেশী-ভাগ দৃষ্টি। স্তনের উপর অবধি আঁটিয়া লুঙ্গি পরে বলিয়া, স্বাধীনভাবে চলা ফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বর্ম্মা জাতির স্ত্রীলোকদের চলা ও নাচা সরল ভাবে হয় না ;—কতকটা আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ভাব।

বর্ম্মার লোক অলস, এবং আমোদ ও সজ্জাপ্রিয় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহারা ভাবে না। সেই জন্য অনেক লোকই ঋণগ্রস্ত। নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি প্রায়ই হইয়া থাকে। ভেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, নৌকার বা'চ-খেলা সচরাচরই দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ ধনধান্যে পূর্ণ। আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণের জন্য শেগুন কাঠ ও আহারের জন্য চাউল অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত জন্মে। আহার ও আশ্রয়-স্থান,—এই দুইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্যক—দ্রব্যের এত সহজে যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাসাচ্ছদন সুলভ হইলে সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে,—লোকেরা অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটিয়াছে। তাই দেশ রত্নপ্রসূ হইলেও বর্ম্মাবাসী এখন আর তত লাভবান্ নয়। লাভের বেশীর ভাগই বিদেশী ব্যবসাদার ও সুদখোরের হাতে যায়।

ব্রহ্মদেশে সচারাচর শবদেহ গোর দেয়, এবং ফুঙ্গীদের শবদেহ দাহ করা হয়। কখন কখনও বা কিছু দিন গোর দিয়া রাখার পর সেই শবদেহ পুনরায় উঠাইয়া বহু সমারোহের সহিত দাহ করা হয়। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ-পালন-রূপ একটি নিয়ম পালন করিতে সকলেই বাধ্য, ও সকল দেশেও সেইরূপ। আশৌচ কালে আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে বাঁধা নিয়ম আছে। আত্মীয় বুঝিয়া অশৌচের দিন বাড়ে ও কমে ; সে সময়ে নিরামিষ ভোজনই কর্ত্তব্য। স্ত্রী মরিলে অশৌচ কম, স্বামী মরিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাপ-মায়ের জন্য অশৌচ স্বামীর অশৌচের মত ; তিন দিন নহে। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ

অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধেয়, ও অঞ্চলে সর্ব্বত্র সেইরূপ সাদা রঙ্গই শোক প্রকাশের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত। ইউরোপে কিন্তু সাদা রং শোকব্যঞ্জক নহে; কালো রঙই শোকব্যঞ্জক।

চাউল ও শেগুন কাঠই বর্ম্মার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়া হীরার খনি ও বর্ম্মা-অয়েল নামক কেরোসিন-জাতীয় এক প্রকার খনিজ তৈলও পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এত থাকিতেও বর্ম্মার লোক গরীব। আলস্য ও অবিবেচনাই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা কিন্তু কাঠ ও গালার কাজে সুনিপুণ শিল্পী। রেশম ও বর্ম্মা চুরটের অল্প-বিস্তর কারবার চলে। আমি এ সকল জিনিষের কিছু কিছু নমুনাও আনিয়াছি।

বর্ম্মাবাসীরা তাড়ি খায় এবং মাতলামি করে; কিন্তু চীনদেশে অমন দেখি নাই। সকল দেশের সব পাপ-অভ্যাসগুলি বর্ম্মাবাসীরা আজকাল অনুকরণ করিয়াছে। শুনিলাম, তাদের দেশে মদ বা আফিং কিছুরই তত প্রচলন ছিল না। এখন চীনেদের কাছ থেকে আফিং ও পাশ্চাত্য জাতি ও ভারতবাসীর নিকট মদ খাইতে শিখিয়াছে। একটা তাড়িখানার কাছে দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোকের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিলাম। তারা অতি অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া আমায় ভেঙ্গচাইতে লাগিল! কিন্তু চীন দেশে কত আফিং খাবার আড্ডায় গিয়াছি, তারা কেহ কিছু বলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বর্ম্মাবাসীর তীর্থস্থান। অনেক যাত্রী বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসেন। আমি যখন দেশে ফিরিতেছিলাম, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থ করিতে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেন,—আমার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে। ছেলে-মেয়েতে আমাদের ঘর ভরা, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না।

চীন দেশেও এই পরিচয় পাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতে দেখিতাম। বৃদ্ধারা স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন,; তাঁহাদের প্রথম প্রশ্নই এই। অল্পবয়সীরা শুনিতে চান, অথচ মুখ ফু'টে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,—প্রশ্ন করিবার অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন; অথবা অন্যের মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা করেন! বিবাহ ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদলভুক্ত মনে করেন, এবং মিশিবার সঙ্কোচ আরও কমে। ছেলেপুলের কথা শুনিলে সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই আনন্দের সীমা থাকে না; পুরুষদের আনন্দ অতটা বেশী বলিয়া মনে হইত না। সকলেই ছোট ছেলে ভালবাসে। আমিও যখন অন্যের ছেলেকে আদর করিতাম, তখন স্পষ্টই বুঝিতাম, তাদের মা-বাপের মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিত।

জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে বাহির হইয়া এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মগ আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল। তার ছেলেটিও বাপের দেখাদেখি এসে হাত পাতিল। ছোট ছোট হাতগুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার শরীরে কোনও রোগলক্ষণ নাই। কুষ্ঠীর স্ত্রীকেও দেখিলাম। গরীব হইলেও বেশ-ভূষা স্বামী অপেক্ষা অনেকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার কাছে রৌপ্য-মুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিতে ইতস্ততঃ করিয়া একটি ক্ষুদ্রতম রৌপ্যমুদ্রা কুষ্ঠীর হাতে দিলাম। হিন্দীতে বলিলাম, দু'জনে ভাগ করে নিও। ছেলেটি হাতে না পেয়ে বড়ই বিষণ্ণ হলো। জাহাজে ফিরিয়া আসিয়াও মনে হতে লাগল, তার হাতে কিছু দিয়া আসি।

মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোক তাঁর ছোট ছেলেটিকে জানু পাতিয়া বসিয়া উপাসনা করিতে শিখাচ্ছিলেন। আমার সে দৃশ্য বড়ই ভাল লেগেছিল। ছেলেমানুষের ভাবে ও আধ-আধ স্বরে যেমন এক স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়, তারও প্রত্যেক অবয়বে প্রত্যেক কার্য্যে সেই ভাব পরিস্ফুট।

বর্ম্মার দোকানে জিনিষ কিনিতে গিয়া অন্যত্র জিনিষ কেনার মত অত বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, স্ত্রীলোকেরা বেচে বলিয়া। চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দোকানী পাঁচ ডলার মূল্য বলিয়া দশ সেণ্টে জিনিষ বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস! কিন্তু এখানকার দোকানে স্ত্রীলোকেরা বস্তুতঃ আমাদের দেখিয়া প্রায় ঠিক ঠিক দাম বলে। বেশী দর দস্তুর করিতে হয় না। অসহায় বিদেশী বলিয়া স্ত্রীলোকসুলভ করুণ ভাব তাদের ব্যবহারেও দেখা যায়।

একটি ছাউনিওয়ালা বাজারে কিছু জনতা দেখে ভিতরে গিয়া দেখলাম, অনেকগুলি লোক জড় হয়ে কিসের মীমাংসা করিতেছে। এত লোক, তবু তত গোল নাই। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও গোলমাল শুনা যাইত। একটি নম্রমুখী যুবতীর সম্মুখে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল। যুবতী নিজের দোকানে বসিয়াছিল, নীচের একটি দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ বর্ম্মণ যেন মর্ম্মাহতের মত বসিয়াছিল। তার পাশেও অনেক লোক। এক সুরাটী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'য়েছে? শুনিলাম,—এই যুবতী বৃদ্ধের স্ত্রী,—হালে বিবাহিতা। রমণীর সহিত দোকানে প্রত্যহ এক বর্ম্মা যুবক আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করে,—রমণী তাহাকে চুরট উপহার দেয়। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে দু'পুরবেলা ভাত দিতে এসে দেখে গিয়ে বাপকে ব'লেচে। তাই বৃদ্ধ, ব্যাপার কি ভাল করিয়া জানিবার জন্য নিজেই এসেছে। তার মুখের ভাব বড়ই কষ্টব্যঞ্জক,—প্রতিশোধেচ্ছার মত প্রচণ্ড নহে। যেন সন্দিগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতেছে, কেন এমন অসময়ে এমন হলাহল পান করিলাম! যুবতী নম্রমুখী; কিন্তু তাহাকে অনুতপ্তা বলিয়া মনে হইল না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বর্ম্মা যুবক আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে! নয় ত প্রণয় ক'রে পা

বাড়াতে কাতর, এমন ভাব তাহার মুখে ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তার দোষ ঢেকে তার পক্ষসমর্থন ক'চ্ছিল। সকল পুরুষদেরই দেখিলাম বৃদ্ধের দিকে টান। কে জানে কেন, বুড়োর প্রতি আমার অণুমাত্রও সহানুভূতি হ'লো না। অবিবেচনার কার্য্যে, অসম্ভব বিষয়ে সহানুভূতি কেমন ক'রে হবে?

এক দিন লেক্ পার্ক দেখিতে যাবার সময় রাস্তায় দেখিলাম একটি আধবয়সী বর্ম্মা রমণী কাঁদছে। দু' জন লোক তাকে সাবধানে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। সে বড়ই আকুলভাবে কাঁদছিল। কাঁদ্‌চে এ জান্‌তে তো ভাষা জানার দরকার হয় না। তবে কি জন্য ও কাহার জন্য কাঁদ্‌চে জানিবার জন্য আমার ঘোড়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে জেনে বল্লে, সর্পাঘাতে উহার ছেলে মারা গিয়েছে, তাই কাঁদচে। কান্নার বুলিটি এইরূপ,—"তুমি গেলে আমি রইলাম, তোমাকে আর ঘরে গিয়ে দেখ্‌তে পাব না, সে ঘরে কেমন ক'রে থাক্‌বো?" ঠিক কি আমাদের দেশের মত! তার সঙ্গীরাও কাঁদতে কাঁদতে তাহাকে বুঝাচ্চে—ঠিক কি আমাদের দেশের মত! পথে যে দেখ্‌চে, যে শুন্‌চে সেই চোখের জল ফেলে যাচ্চে,—ঠিক কি আমাদের দেশের মত!

দুই দিন পরে রেঙ্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িল। একটি স্ত্রীলোক এক প্রৌঢ়াকে জাহাজে চড়িয়ে দিতে এসেছিল। জাহাজ ছাড়িলে সে নদীতীরে ধূলায় লুটিয়ে অতিশয় কাতর হ'য়ে কাঁদতে লাগল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম রেখার মত তার দেহটি মাটিতে পড়ে রয়েছে।

পিনাঙ।

[প্রথম প্রস্তাব।]

রেঙ্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দুই দিন দুই রাত ক্রমাগত যাওয়ার পর চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। এ সকল জমি রেঙ্গুনের মত সমতলভূমি নয়; কেবল পর্ব্বতময়। উপকূলের চতুর্দ্দিকেই সমুদ্র হইতে মাছ ধরিবার বিপুল আয়োজন দেখিলাম; বড় বড় কাল রঙ্গের খুঁটী দিয়া স্থান ঘেরা—জাল ফেলা। ধীবরদের থাকিবার জন্য তীরে ছোট ছোট করুগেট আয়রণের ঘর। পা'ল তোলা নৌকায় অহরহ তীর আচ্ছন্ন। ভাত আর মাছই এ সকল দেশের প্রধান আহার। এই সকল মাছ শুকাইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত বেশ রাখা যায় ও তাহাই অন্য দূরবর্ত্তী স্থানে রাশি রাশি রপ্তানি হয়। এখানকার সকল দেশেই শুটকে মাছ একটী উপাদেয় খাদ্য। এ সকল দেশে কত নূতন রকমের মাছ দেখা যায়। 'জেলী ফিস' (Jelly fish) নামক এক প্রকার মাছ ঠিক জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। চিত্র-বিচিত্র করা ছাতার মত দেখিতে। তার চতুর্দ্দিক হইতে যেন নানা রঙ্গের ফল-ফুল ঝুলিতেছে। (Cuttle fish) 'কাটেল ফিস' নামক আর এক রকম লম্বা লম্বা দাঁড়াসংযুক্ত গোল মাছ মাথা নীচের দিকে করিয়া জলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা বড় হিংস্রক ও প্রণীভোজী; কিন্তু চীনে-ম্যানেরা অতি উপাদেয় মনে করিয়া এই জাতীয় শুক্‌না মাছ খায়।

বন্দরে জাহাজ ঢুকিবামাত্রই অসংখ্য "সামপান" আসিয়া জাহাজের চারি ধার ঘিরিল। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান। তাহারা তাহাদের প্রিয় নীলবর্ণের ঢলঢ'লে পোষাক পরিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় বাহিয়া

জাহাজের সহিত চলিতে লাগিল। চীনে যাত্রীদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে খোনা খোনা চীনে ভাষায় তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বোধ হয় তীরে নামাইবার দরদস্তরের কথা হইতেছিল। জাহাজের উপর দড়ি ছুড়িয়া দিয়া তাহারা সেই দড়ি ধরিয়া জাহাজে উঠিল। সিন্দুক ও তোরঙগুলিও দড়ি বাধিয়া জাহাজ হইতে সামপানে ফেলিয়া দিতে লাগিল। বিষম কোলাহল হইতে লাগিল ও ব্যগ্রতার চিহ্ন চারিদিকে দেখা গেল। কাড়াকাড়ি, মারামারি দেখিয়া আমি মনে করিলাম, নিশ্চয়ই কতকগুলি লোক মরিবে ও জখম হইবে; কিন্তু সেরূপ কোন দুর্ঘটনাই হইল না।
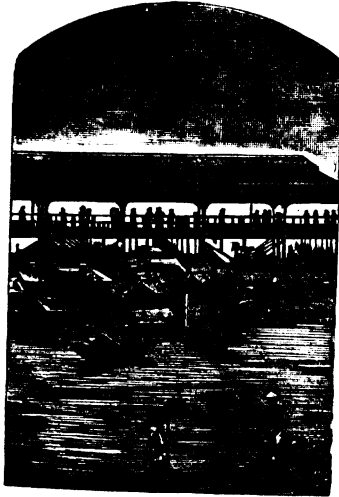
"সামপান।"

মালয়দেশ হইতেই চীনেম্যানের দেশ আরম্ভ হইল বলিলেই চলে। রেঙ্গুনে তিন ভাগের এক ভাগ চীনেম্যান। এখানে শতকরা ৮০ জন চীনেম্যান। প্রায় সব ব্যবসাদার চীনে; কুলি মুটে মজুর অধিকাংশই চীনে। অসংখ্য জীন-রিক্স বা ঠেলাগাড়িওয়ালা; সকলেই চীনে।

চীনেম্যান সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে,তাহা এ প্রবন্ধে কুলাইবে না; স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সেই সকল কথা বলা হইবে। চীনেরা অদ্ভুত জাতি। আকৃতি, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা,—সকল রকমেই ইহারা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তীরে একটি বড় (Clock Tower) ক্লক টাওয়ার ও তার ধারেই একটি ছোট জেটী আছে। সেখান হইতে বোঝাই হইয়া মালপত্র ছোট রেলগাড়ী সহযোগে সহরের ভিতর নীত হইতেছে। রাস্তাগুলি চওড়া ও অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাদা কাঁকর ও বালি দিয়ে বাঁধান। ঠেলাগাড়ী ছাড়া ঘোড়ার গাড়ী বেশী নাই বলিয়া রাস্তা খারাপও হয় না। আমাদের কলিকাতার মত ঐ রাস্তার ধারে ফুটপাথ নাই। দুই ধারেই দোকান। অধিকাংশ দোকানেই বিলম্বিত-বেণী চীনেম্যান নিবিষ্টচিত্তে আপন আপন কাজ করিতেছে। রিক্স গাড়ী চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছে। একবার জাহাজ হইতে কিনারায় নামিলে হয়; অমনি দশখানি রিক্স তোমাকে ঘেরিবে।

সকলেই তোমাকে চড়াইতে ব্যস্ত। এত মানুষ, ও মানুষের পরিশ্রমের মূল্য এত সস্তা যে, দুই জন মিলিয়া একখানি রিক্সতে চড়িয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বেড়াও। প্রতি ঘণ্টায় ২০ সেণ্ট মাত্র দিতে হইবে। এখানকার মুদ্রার নাম 'সেণ্ট' (Cent) ও 'ডলার' (Dollar)। আমাদের দেশের মুদ্রার এক টাকা ছয় আনায় একটী ডলার পাওয়া যায়। ১০০টী সেণ্টে একটী ডলার হয়। এক টাকায় যেমন ৬৪টী পয়সা, তেমনি ৭০টী সেণ্ট পাওয়া যায়। কলিকাতায় চিঠি লিখিবার জন্য পোষ্টকার্ডের দাম ৩ সেণ্ট ও টিকিটের দাম ৪ সেণ্ট। রিক্স গাড়ীগুলি দেখিতে ছোট বগী গাড়ীর মত—দ্বিচক্র, হাল্কা ও নানা রঙ্গের ফুল, পাখী ইত্যাদি চিত্র-বিচিত্র করা। জানু অবধি পা, কাটা পাজামা ও কনুই অবধি হাত

কাটা চলচ'লে কোট পরিয়া এবং প্রখর আতপ নিবারণের জন্য একটী চেঁচাড়ীর হ্যাট (Straw hat) মাথায় দিয়া, ঘাম মুছিবার জন্য গলা হইতে একখানি রুমাল ঝুলান সুগঠন চীনেম্যান, যাত্রীসহ দ্রুতবেগে এই গাড়ীগুলি দিনে আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা টানিয়া বেড়াইতেছে। এত অধিক পরিশ্রমের ফলেই তাহারা হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হয় এবং ১০।১২ বৎসর এইরূপ পরিশ্রম করার পর, অল্পবয়সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চীনেম্যানদের মধ্যে হৃদ্‌রোগ সচরাচরই দেখা যায়।

মালয়দেশ ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু দেখি নাই; কারণ এ সকল স্থানে চীনেম্যানই পনর আনা, মালয় অতি কম। তবে যা দেখেছি তাহাতে মনে হয়, সে দেশের লোকেরা অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তাহারা বেঁটে, সুস্থকায় ও সবল; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য বড় একটা তাহাদের নিজেদের হাতে নাই। এখানকার ভূমিও ব্রহ্মদেশের মত তত ধন-ধান্যে পূর্ণ নয়। ব্রহ্মে তবুও স্ত্রীলোকেরা ব্যবসা করে,—দোকান করে; কিন্তু এখানে কেহই সেরূপ কাজ করে না। একটা কথা প্রচলিত আছে, "Malay is a good horseman," অর্থাৎ ঘোড়ার কাজে মালয় খুব মজবুত যেমন চড়িতে, তেমনি তার তোয়াজ করিতে। সকলেই ছোট কাজ লইয়া আছে। ইহারা হয় ঘোড়ার গাড়ীর সহিস-কোচওয়ানি, নয় পোষ্টপিয়ন, বেহারা বা পাহারাওয়ালার কাজ করে। অতি পরিপাটী প্রভুদত্ত সুন্দর পোষাক পরিয়া তাহারা সুস্থ শরীরে সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু দাড়ী রাখে না।

তাহারা আমাদের মত ছোট করিয়া চুল ছাঁটে,—চীনেম্যানের মত আজানুলম্বিত বেণী (Pigtail) ইহাদের নাই। লুঙ্গী পরে, কোট গায়ে দেয় ও বাঁকা করিয়া কেপ (Felt cap) মাথায় দেয়। স্ত্রীলোক-দের তেমন অবরোধ প্রথা নাই। অনেকে মাথায় কাপড় অবধি দেয়

না। তবে কেহ কেহ মাথায়ও কাপড় দেয় ও বাহিরে যাইবার সময় রিক্স গাড়ীর সামনের পরদাটী একটু তুলিয়া দেয় মাত্র।

তাহাদের মসজিদ প্যাগোডার মত চূড়াবিশিষ্ট, এখানকার মসজিদের মত নহে। তাহাদের ভাষা মালাই; কিন্তু আরবী অক্ষরে লিখিত হয়। বহুদিন পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকালে আরব জাতির প্রভাব, ব্যবসাসূত্রেই হউক বা ধর্ম্ম প্রচারার্থই হউক, এই সকল দেশ অবধি প্রসারিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এদেশে মুসলমানধর্ম্ম ও আরবী অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ডিঙ্গাইয়া আরব জাতির ধর্ম্ম ও বর্ণমালা এখানে যে কেমন করিয়া, কাহা কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

পিনাঙ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

কি জানি কেন, যত যায়গায় গেলাম, তথাকার সকলকে ভারত-বাসী অপেক্ষা সুস্থ শরীর, সন্তুষ্টচিত্ত ও সুখী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাদের বুদ্ধি কম ; সুতরাং উচ্চাশাও কম। আর উচ্চাশা নাই বলিয়া তাদের মনের অসন্তুষ্টি ও অশান্তিও নাই। অপূর্ণ উচ্চাশা হইতেই মনে অশান্তি আসে ; তাই ভারতবাসীর শরীর এত অসুস্থ,—মন এত দুর্ব্বল। মালয় চীনেম্যানের সে অশান্তির ছায়া মোটেই পড়ে নাই। তাই তাদের শরীর এত সুস্থ ও দেহ এত সবল।

এ সকল অঞ্চলের যত লোক—ব্রহ্মবাসী, মালয়, চীনেম্যান বা জাপানী,—সকলেরই শরীরের গঠন ও রীতি-নীতির অনেকটা মিল আছে। সকলেই মঙ্গোলিয়ান জাতিভুক্ত। গালের হাড় উঁচু ; চোখ-গুলি ছোট ছোট ও ঈষৎ বাঁকা, রংটি ফ্যাকাসে; মুখে লোম অতি অল্প জন্মে এবং চুলগুলি লম্বা ও সোজা। ইহাদের সকলেরই প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। ময়দার বড় একটা ব্যবহার নাই। প্রায় সকলের ধর্ম্মেই অল্পবিস্তর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংমিশ্রন আছে। বোধ হয়, তাহাদের দেশে শুক্না মাছ খাওয়ার এত যে প্রচলন, তাহাও "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" হইতে উৎপন্ন। নিজ হাতে প্রাণীহত্যা করিতে নাই, কিন্তু অন্যে মারিয়া দিলে খাইবার কোন আপত্তি নাই! সকলেরই ঢলঢ'লে পোষাক। অধিকাংশ লোকই আফিং ও চা-সেবী। সকলেই যেন চীনেম্যানের অনুকরণ করে। স্ত্রীলোকেরা চুল লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা পরিপাটী করিয়া খোঁপা বাঁধে ও সেই খোঁপাটী অনাবৃত রাখে এবং

মরাল গ্রীবাটী সকলকে দেখাইতে ভালবাসে। তাই প্রাণান্তেও তাহারা মাথায় ঘোমটা দেয় না। এ অঞ্চলে কোথাও স্ত্রীলোকদের মস্তকাবরণের (head dress) প্রচলন নাই।

যেমন একধারে সহরঠাসা লোক ও দোকান তেমনি অন্য দিকে ফাঁকা স্থানও আছে। সেখানে ধনীদের বাগান ও পাতরের বসত বাড়ী; এবং গরীবদের বাঁশ ও নারিকেল পাতা নির্ম্মিত কুঁড়ে ঘর। বড় বড় নারিকেল গাছের বন—এক একটী গাছ আমাদের দেশের গাছ অপেক্ষা তিন চারিগুণ উচ্চ; তাহার ফলগুলিও তদনুরূপ বড়। কিন্তু তার ভিতরের শাঁস সেরূপ পুরু নয় বা এদেশের নারিকেলের মত মিষ্টও না। রাশি রাশি নারিকেল পিনাঙ হইতে রেঙ্গুনে আমদানি হয়। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা তাহা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া চিঁড়ে ও নানাবিধ খাবার প্রস্তুত করে এবং পচা মাছের সঙ্গে মিশাইয়া "নপ্পি" নামক চাট্নীও প্রস্তুত করে। নারিকেলের মালাটি হুকার খোলের জন্যও ব্যবহৃত হয়। পিনাঙএর বাঁশগাছগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদ্বারা চেয়ার, কৌচ আদি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয়; সে দ্রব্যগুলি অতি সুচারু ও দামেও অতি সস্তা। লজ্জাবতী লতায় জমি একেবারে আচ্ছন্ন। লাল গোলাকার ফুলগুলির পাশে সতেজ পাতাগুলি মানুষের পদসঞ্চারে, বেগগামী রিক্সের হাওয়ায়, ধুলাতে বা মাছির ভরে অহরহ বুঁজিতেছে ও খুলিতেছে। আমি আমার পকেট বহিতে পূরিয়া ঐ লজ্জাবতীর অনেকগুলি পাতা ও ফুল আনিয়াছি।

যে বন্দরে যখন জাহাজ লাগিত, আমি তখনই আমার "বয়"কে আমার কামরায় খাবার রাখিতে বলিয়া সহর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিতাম। যদিও বিদেশ-বিভুঁই, তথাপি যেখানে সেখানে যাইতে ও বেড়াইতে আমার একটুও ভয় করিত না। সর্ব্বদাই মনে হইত, সুশাসিত রাজ্যে সকলেরই ধন-প্রাণ নিরাপদ। ভীষণ বর্ব্বর

জাতিরাও প্রথর সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরুপদ্রবে সমাজের হিতকর কার্য্যে রত হইয়াছে।

সকল স্থানেই তীরে নামিয়া প্রথম যাইতাম ডাকঘরে। সেথানে চিঠিপত্র লিথিয়া সহর-ভ্রমণে বাহির হইতাম। ডাকঘরের সকল কর্ম্ম-চারী চীনেম্যান হইলেও তাঁহারা কিন্তু ইংরাজী বুঝেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তথায় দেথিবার উপযুক্ত কি কি দ্রব্য বা স্থান আছে, তাহা জানিয়া লইতাম। তাঁহারাও সসম্মানে ও সযত্নে চীনে রিক্স-ওয়ালাকে বুঝাইয়া দিতেন, আমাকে কোথায় কোথায় লইয়া যাইতে হইবে।

পিনাঙে প্রধান দুইটী দেথিবার জিনিষ আছে,— চীন দেশের ধর্ম্ম-মন্দির এবং জলপ্রপাত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিনাঙ একটী পর্ব্বতময় স্থান। শুধু পিনাঙ নহে, পরে আমরা যেথানে যেথানে গেলাম, তাহার সকল স্থানই পর্ব্বতময়। পাতরের স্থান। রেঙ্গুনের মত উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র আর কোথাও দেথিতে পাওয়া যায় না। চীনে সমুদ্রতীরও পর্ব্বতময়। জাপানও আগ্নেয়-গিরিসমাকুল পর্ব্বতময় দ্বীপ। তবে পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরেই খানিকটা সমতলভূমি আছে, সহরটী তথায় অবস্থিত। উহার পিছনে ও চারিপাশে উচু উচু পাহাড়। অনেকগুলি ছোট নদী এই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া, সহরের মধ্য দিয়া কুল্ কুল্ রবে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। তাই পিনাঙে,—রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতির মত পানীয় জলের অভাব নাই।

প্রথমেই চীনদের মঠ দেথিতে গেলাম। উহা সহরের বাহিরে প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ে অবস্থিত। ঠিক সেই পাহাড়ের গা বাহিয়া একটী ছোট স্রোতস্বতী যেন মৃদুস্বরে স্তুতি গান করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। পাতরে বাঁধান সিঁড়ি, প্রাচীর,

অট্টালিকা, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবগৃহ স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। বাগানের চারিদিকের নালায় কত পদ্মগাছ ঝরণার জলস্রোতে জন্মিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটী উচ্চ ফোয়ারা। ঘরে পুরোহিতেরা একত্রে বসিয়া রহিয়াছে, কেহবা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছে। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত, বিনানী নাই। তাঁহারা সযত্নে আমাকে মন্দিরের সকল স্থান দেখাইলেন। তাঁহাদের ভাষা বুঝাইয়া দেয়, এমন কোন লোক ছিল না। ইঙ্গিতে যতদূর বুঝা যায়, বুঝিলাম। দেবগৃহে ভীষণাকার দেবতা বা দৈত্যের মূর্ত্তি সংস্থাপিত। মুখে ক্রোধব্যঞ্জক ভ্রূকুটি; হাতে বদ্ধমুষ্টি বা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র; দাঁড়াইবার ভঙ্গী যেন আক্রোশপূর্ণ। সকল মূর্ত্তিরই কর্কশ ভাব। নম্র ভাবের একটী মূর্ত্তিও নাই। একটীও স্ত্রীলোকের বা বালকের মূর্ত্তি নাই। শুনিলাম পৌত্তলিক তেওস্ত ধর্ম্মোক্ত এই মূর্ত্তিগুলি চীনেম্যানদের বীর পূর্ব্ব-পুরুষগণেরই মূর্ত্তি। চীনেম্যানদের বাড়ীর দেওয়ালেও এইরূপ ছবির পট দেখা যায়। যাঁহারা বিপুল পরাক্রমে চীনকে শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইয়াছেন, এ সকল তাঁহাদেরই প্রতিমূর্ত্তি। অধিকাংশ চীনবাসিগণ এই সকল মূর্ত্তিকেই পূজা করিয়া থাকেন। তবে মন্দিরের কোন কোন ঘরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবেরও প্রশান্তমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। চীনবাসিগণ এই সকলকে আলো, ধূপ, ধুনাদি দিয়া পূজা করেন।

মন্দির দেখা শেষ হইলে জল-প্রপাত দেখিতে গেলাম। উহা সহর হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বত-পরিখা বেষ্টিত বটানিক্যাল গার্ডেন, সেই খানেই অবস্থিত। ভিতরে ঢুকিলেই জলপ্রপাতের অস্ফুটধ্বনি কাণে যায়। সকল স্থান হইতেই সে ধ্বনি শুনা যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। মনে হয়, নির্জ্জনে কে যেন কার কাণে কাণে মিষ্ট কথা কহিতেছে। সে স্থানটী এমন যে, একটি পাখী ডাকিলে

চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ে তাহা কতবার ধ্বনিত হয়। তারই ভিতর কত রকমের গাছ সযত্নে রক্ষিত। ভারতবর্ষ চীন ও অষ্ট্রেলিয়ার বিবিধ জাতীয় গাছ রক্ষা করাই এই বাগানের প্রধান উদ্দেশ্য। পথগুলি উচু-নীচু, পাহা'ড়ে পথের মত ক্রমে ক্রমে উচু হইয়া জলপ্রপাতের দিকে গিয়াছে। খানিকদূর গিয়া দূর হইতে জলপ্রপাতটি দেখা গেল। স্তূপাকার জলরাশি পর্ব্বতশিখর হইতে প্রায় ১০০ ফিট নীচে পড়িয়া ফেনা দোলাইতে দোলাইতে সবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। খানিক দূর গিয়া সেই সকল জল-তরঙ্গ, উপরে সেতু ও নীচে বাধান পথের মধ্যে দিয়া শৈবালদল কাঁপাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে। চারি পাশে সে দেশের গাছ; গাছগুলি সব সতেজ। এক পাশে আমাদের দেশের চম্পকও দেখিলাম; কিন্তু উহা তত স্ফূর্ত্তি পায় নাই। আমাদের দেশের তেঁতুল গাছগুলি ছোট ছোট, ফলও তদ্রূপ। হবেই তো, বিদেশে, অস্থানে হাজার চেষ্টা করিলেও জীবনীশক্তি স্বদেশের মত তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না। তবে (Orchid) "অরকিড্" গুলি খুব বড়। একপ্রকার পতঙ্গভোজী গাছ আছে, তাহাকে (Pitcher plant) "পিচার প্ল্যাণ্ট্" বলে। সে গাছের "ফুল" গুলি অতি বৃহৎ ও যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে গাছটী মাছি ধরিয়া খায়, সে যন্ত্রগুলিতে মশা মাছির কঙ্কালপূর্ণ। (Fruit Dhurion) "ডুরিয়ন" ফল দেখিতে ঠিক আমাদের কাঁঠালের মত, দুই একটী গাছে ফলিয়াও ছিল; কিন্তু উহা হইতে একরূপ বিকট গন্ধ নির্গত হইতেছিল। ব্রহ্ম, মালয় ও চীনবাসিগণ এই ফলের কিন্তু বিশেষ আদর করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বটানিক্যাল গার্ডেনটী সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক পল্লীর দৃশ্য দেখা যায়। দরিদ্র গৃহস্থদের ক্ষুদ্র চালা-ঘরের দুয়ারে গরু বাধা। অল্পেতেই তুষ্ট

হইয়া লোকগুলি কায়িক পরিশ্রমে, সুস্থ শরীরে, অতিসুখে দিন যাপন করিতেছে। সকলেরই মুখে হাসি,—সর্ব্বত্রই আনন্দের রোল। উদ্যান হইতে বাহির হইয়া একটি স্থানে কিন্তু বড়ই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিলাম। কোন গৃহের কর্ত্তা ভর্ত্তা রক্ষক ও পালক আজ ইহধাম ছেড়ে গিয়েছেন। কাপড় ঢাকা তাঁহার শবদেহ গৃহদ্বারে শয়ান আছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ধূলায় লুটিয়ে কাঁদচেন। কাপড় তুলে মৃত পতির মুখ দেখ্‌তে যাচ্চেন, তাঁর আত্মীয়েরা বাধা দিচ্চে। বড় ছেলেগুলি ও ছোট ছেলে মেয়েগুলি কাঁদচে। পাড়াপড়শীরা কাঁদচে। লোকে পথ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে কাঁদচে। এক প্রতিবেশিনী তার ছোট ছেলে কোলে ক'রে কাঁদচে। তার সেই ছোট ছেলেটীও মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদচে আর ছোট হাতখানি বাড়িয়ে মায়ের চ'খের জল মুছে দিচ্চে।

বটানিক্যাল গার্ডেন হইতে আরো খানিক দূরে এক স্থানে দেখি, কতকগুলি কুলি এক জায়গায় বারুদে আগুন দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে পাতর ভাঙ্‌ছে। তা'দের মধ্যে একটী কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ লোক সুকণ্ঠে, কান্নার মত অতি করুণস্বরে, গান গাহিতে গাহিতে পাতর বহিতেছিল। তাহার মুখের গড়ন মালয় দেশীর মতও না, চীনেম্যানের মতও না। তাহার নাসিকা উন্নত। আমাদের দেখিয়া সে ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে পাতরগুলি মাটিতে নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি হিন্দুস্থান হ'তে এসেছেন ?" আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে উত্তর দিলাম,—"হাঁ। কিন্তু তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে ?" সে বলিল,—"আমার বাড়ী মাদ্রাজে। আমি বড় রাগী, ঝগড়া ক'রে একটী লোককে খুন করাতে আমার মেয়াদ হ'য়েছিল, বছর কতক হ'ল খালাস পেয়ে আমি এক ব্যবসাদারের সঙ্গে এখানে এসে কুলির কাজ কচ্চি।"

পরে সে আপনিই বল্‌তে লাগল,—"আমার কেউ নাই, আমি ইংরাজি স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলাম। তার পর এখানে এসে এক মালয় স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছি। সে বড় ভাল। সে আমায় বলে, 'তুমি যে দেশে যাবে আমিও সঙ্গে যাব,—মার বারণ শুনব না'।"

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম লোকটি রোজ ২০ সেণ্ট রোজগার করে। তার স্ত্রী অনেক ভাল জিনিষ তাকেই খাওয়ায়, আপনি খায় না। সে নিজে সারাদিন খাটে, বাড়ী যেতে পায় না; আর তার স্ত্রী রোজ দুপুরবেলা ঘরের কাজ সেরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আজ আসে নাই। স্ত্রীর পায়ে সেদিন একটা পাতর গড়িয়ে চোট লেগেছে। তাই স্ত্রীর পায়ে আজ সে লসুনের তেল মালিষ ক'রে দিয়ে এসেছে।

সে বলিল,—"এক জনা বলেছিল—এতেই সেরে যাবে। তার পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে,—সে চল্‌তে পারে না।" এই সব কথা এমন সরল কাঁদ-কাঁদ ভাবে ব'লতে লাগল যে, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছিল, ছুটে গিয়ে তার স্ত্রীর পায়ে এমন ঔষধ বেঁধে দিয়ে আসি, যাতে তার ব্যথা এখনি ভাল হ'য়ে যায়,—এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে।

সেই কুলীর সহিত আমার আরো কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রী-সঙ্গী একটী সাহেব বড় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন; সুতরাং আর বেশী কথা হইল না। আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি যে গানটী গাচ্ছিলে, তার মানে কি?" সে যাহা বুঝাইয়া দিল, বাঙ্গালা ভাষায় তার ভাব এইরূপ,—

"তুমি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার ঘোর দুর্দ্দিনের সময় তুমি কোথায় ছিলে? জীবনের প্রথম অবস্থায় তোমাকে পাই নাই কেন? এতদিনে পেয়েছি,—সব ব্যথা জুড়িয়ে দিয়েছ, সব কষ্ট ভুলে গেছি।"

যেরূপ অন্তরের সহিত সে গানটী গাচ্ছিল, হিন্দীতে বুঝাইয়া দিবার সময়েও যেন "যার পায়ে চোট লেগেছে" তার মধুর ছবি তার অন্তশ্চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াল ; তার মুখে খুনে দস্যুর ভাব একটুকুও দেখিলাম না।

সে আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে এল। আসিবার সময় তার কাঁধের কাছে একটা দাগ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কিসের দাগ? সে ব'ল্লে, "দু'বছর আগে যখন আমি আমার স্ত্রীকে বিয়ে করি তখন আমার শ্বশুর ও পাড়াশুদ্ধ লোক মিলে আমাকে মেরেছিল। খুব মেরেছিল। কেটে রক্তারক্তি হ'য়েছিল। কত দিন ভুগী। ও তারই দাগ।" তারপর সে আপনিই ব'ল্লে,—"কাজ শেষ হলে যখন বাড়ী যাই আমার স্ত্রী এই জায়গায় হাত বুলিয়ে দেয় আর কাঁদে।" তার ওইরূপ সরল কথা শুনে আমার চোখে জল এলো। খুনে অশিক্ষিত কুলী যে মানবহৃদয়ের এত গূঢ় ভাব কোথা থেকে বর্ণন করতে শিখলে তা ভেবে পেলাম না।

সারাপথ তার কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে ফিরে এলাম। পরদিন বিকালে ঠিক ৫টার সময় পিনাঙ হ'তে জাহাজ ছাড়িল। তখন সেই ক্লক টাওয়ারে মধুর স্বরে ঘড়ি বাজছিল।

সিঙ্গাপুর

[প্রথম প্রস্তাব।]

মালয় দেশে আমি তিনটি স্থান দেখিয়াছি। প্রথমটি পিনাঙ। পিনাঙের কথা পূর্ব্বের দুই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। মালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর সিঙ্গাপুর। পিনাঙ হইতে সিঙ্গাপুর যাইতে তিন দিন লাগে। তবে পথে পোর্ট সুইটেনহাম নামক এক বন্দরে ঘণ্টা কতকের জন্য জাহাজ থামে।

সুটেনহাম একটি ছোট বন্দর; সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র। সমতল ভূমির উপর এ স্থানটি অবস্থিত বলিয়া এখান হইতে রেলযোগে মালপত্র মালয় দেশের ভিতরে বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। পিনাঙ বা সিঙ্গাপুর দুইটি স্থানই দ্বীপে অবস্থিত, এই কারণে এই সকল স্থান হইতে মালয় উপদ্বীপের মধ্যভাগে রেল যাওয়া অসম্ভব। তাই এ স্থানে একটি নূতন আড্ডা করা হইয়াছে। এ স্থানটি নিচু সমতলভূমির উপর; অল্পদিন হইল নিবিড় জঙ্গল কাটিয়া স্থাপিত। সহরটী বড় স্যাঁৎস্যাঁতে; মশার উৎপাত ও জ্বরের প্রাদুর্ভাবও এইজন্য এখানে বেশী। প্রতিভাশালী ডাক্তার রসের আবিষ্কারানুসারে আজকাল স্থির হইয়াছে যে, এক জাতীয় দূষিত মশক দংশনই ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তির কারণ। সেই কারণে বর্ষার ঠিক শেষে ও শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ পূজার সময় ও পরে যখন মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকে, সেই সময় মশাও বিস্তর জন্মে। তাহার ফলে ঐ সময় আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের যত প্রাদুর্ভাব হয় অন্য সময়ে তত হয় না। কিন্তু সুইটেনহাম বন্দরে সমুদ্রোপকূলের মাটি অনবরত ভিজা থাকাতে বার

মাসই এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। সে ম্যালেরিয়া হইতে কাহারও, —বিশেষ ইউরোপবাসীদের রক্ষা পাওয়া দায়। তা'ছাড়া আসাম অঞ্চলে যে "কালা-আজর" নামক এক প্রকার জ্বর হয়, সে জ্বরও এখানে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্থানটীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও ব্যবসার উন্নতি হইতেছে না। আমরা রেঙ্গুন হইতে আনীত বিস্তর চাল ও কতকগুলি বিলাতী কাপড়ের গাঁট নামাইয়া দিলাম মাত্র, সেখান হইতে কিছুই লইলাম না।

আজকাল মশা মারিয়া এখানকার ম্যালেরিয়া কমাইবার প্রস্তাবও হইতেছে। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে শীঘ্রই স্থানটির উন্নতি হইবে। সেখানে যে ৫।৬ ঘণ্টা ছিলাম, তার মধ্যে আমি ভয়ে ভয়েই স্থানটী দেখিয়া বেড়াইয়াছি। ভয়ের কারণ, পাছে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যালেরিয়া ধরে! দেখিবারও তথায় বেশী কিছুই নাই। রেঙ্গুনের মত নিচু সমতল ভূমি বলিয়া এখানকার রাস্তাগুলিও চাওড়া ও সোজা। বাড়ীগুলি কাঠের। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান আড্ডা বৰ্দ্ধমান জেলার মত এখানেও এটেল মাটি দেখিলাম। জমি নরম ও ভিজা বলিয়া হাল্কা করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হয় এবং বায়ু যাতায়াতের জন্য তাহার তলা খুলিয়া রাখিতে হয়। এখানেও প্রায় সকল বাসীন্দাই চীনেম্যান। তারাই দোকান করে। চুল ধুইবার ও বিনাইবার দোকানের পাশেই চণ্ডুর দোকান। তার পাশেই জুয়া খেলিবার আড্ডা। কালো মালয়বাসীরা মাটি কাটিয়া কুলির কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার জলবায়ুতে চির অভ্যস্ত বলিয়া তাহারা ম্যালেরিয়ায় তত ভোগে না।

এখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তার পর পরদিন প্রাতে সিঙ্গাপুর পৌঁছিলাম। শুধু মালয়-উপদ্বীপ নয়, সমগ্র এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্দর। বন্দরে ঢুকিবার সময় দূর হইতেই তাহার

আভাস পাওয়া যায়। অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উপর অতি সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা নির্ম্মিত, ও তাহার চারি পাশেই পিনাঙএর মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ ধরিবার আড্ডা। নানা রকম নূতন নূতন মাছ এখানে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই পিনাঙ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে "কাটেল্ ফিস্ নামক এক প্রকার বড় বড় দাড়া সংযুক্ত গোল মাছ জলের নীচে মাথা নিচু করিয়া চলে। অতিশয় হিংস্র স্বভাব বলিয়া ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর। দেখিতে এক রকম বলিয়া পার্শ্বে ইহার ছবি দেওয়া গেল।
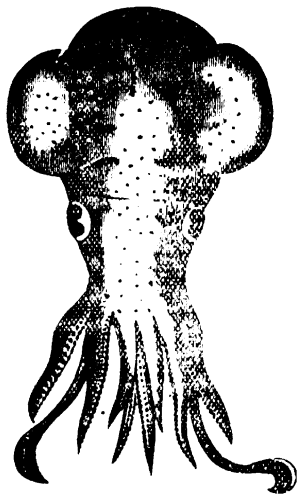
কাটেল ফিস্; মাথা নিচু করিয়া চলে।

একটি কথা আছে,—এ সকল দেশের লোক যত ভাত খায়, তত মাছ খায়। অসংখ্য ছোট বড় সাম্পান কৌশলে ও দ্রুতগমনে, যে দিকে ইচ্ছা পাল তুলিয়া যাইতেছে। হাওয়া যে দিকেই হউক না কেন, এ দেশের মত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত স্থানে মাঝিরা নৌকা চালাইতে এমন শিক্ষিত যে, যে দিকে ইচ্ছা পাল তুলিয়া তাহারা যাইতে পারে।

বায়ুভরে পাল স্ফীত হইয়া যখন নীল রঙে চিত্রিত চোখ আঁকা "ড্রাগন" ঝোলান সাম্‌পানগুলি সমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়ায়, দূর হইতে তখন সে দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। ছোট বড় অর্ণব-পোতের ত সংখ্যাই নাই। নানা দেশের নানা রকম নিশান তুলিয়া বাণিজ্য-তরী সকল সমুদ্রে ভাসমান। এস্থানে কত রকমের বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ-জাহাজ দেখিলাম। কেহ আসিতেছে, কেহ যাই-তেছে, কেহ মাঝদরিয়ায় নঙ্গর করিয়া আছে, কেহ জেটিতে কয়লা বোঝাই লইতেছে। তাদের শিটির বিকট স্বর শুনলে যেন প্রাণ কেঁপে উঠে। ভীমদর্শন গোরা ও কাফ্‌রী সৈন্যগুলি ঠিক যেন যমদূতের মত দেখিতে। আর তাদের ব্যবহারও পশুর মত। রুষ-জাপান যুদ্ধের জন্যই বিভিন্ন দেশের এত রণতরী এখানে জমা হইয়াছে; আবশ্যক বুঝিলেই যুদ্ধে যোগ দিবে। "ষ্টীমলঞ্চ"গুলি তীরবেগে নিকটবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতেছে। বন্দরে ঢুকিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবল নৌকা আর জাহাজ; তা'ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কলিকাতার বন্দরের সহিত তুলনায় এ বন্দর অন্ততঃ দশগুণ বড়। সহরের প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি সব যেন তীরে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জাহাজ জেটির যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ছোটছোট ডিঙ্গীতে চড়িয়া মালয় দেশের কতকগুলি কালো কালো নগ্নমূর্ত্তি লোক আসিয়া জাহাজের চারিদিকে ঘিরিল। তাদের মধ্যে ৮।৯ বৎসরের ছেলেও অনেকগুলি ছিল। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল, এদের কাণ ম'লে স্কুলে দিয়ে আসি। কিন্তু তা'হলে এদের আর এমন স্বাস্থ্য থাক্‌ত না। এরা খুব জবর ডুবুরী। জাহাজের উপর হইতে সিকি দুয়ানি জলে ফেলে দিলে এরা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়ে তা' তুলে আনে। এরা মাছের মত অবলীলাক্রমে সাঁতার দিতে পারে। সমস্ত দিনই এরা ছোট ডিঙ্গীতে চ'ড়ে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়; আর জাহাজ আসিলেই

এইরূপে সিকি দুয়ানী রোজগার করে। এইরূপে প্রতিদিন ওঁদের আয়ও যথেষ্ট হয়। এদের অন্য কোন কাজ নাই। শ্যাম ও মালয়ের সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকেরা সন্তরণ-কার্য্যে অতি পটু। শুনিয়াছি এডেনেও নাকি এরূপ ডুবুরী আছে।

জেলী ফিস্‌।—পিনাং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বন্দরে প্রবেশ করিবার সময় জাহাজের বেগ কমান হইল। চারি দিকে অজস্র "জেলি" মাছ দেখা গেল। সূর্য্য-রশ্মিতে নানা রঙে রঞ্জিত হইয়া তাহারা জলের নীচে খেলিয়া বেড়াইতেছে; দেখিতে ঠিক যেন শ্বেত ও লোহিত আভাযুক্ত পদ্মফুলের মত, অথচ তাদের সারাংশ অতি কম। জল হইতে তুলিলে একফুট লম্বা একটী জেলি মাছ সঙ্কুচিত হইয়া এক ইঞ্চি হয়। ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতে, এই জেলী মাছই জীবের বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা। স্থূল দেহের ভিতর দেহ-নলেরও আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম জীব

সিঙ্গাপুরে আর একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। কালো ফিরিঙ্গীর পোষাক-পরা কতকগুলি মাদ্রাজী জাহাজের ধারে ধারে ছোট নৌকা করিয়া অনেক রকম প্রবাল ও নানাবিধ ছোট বড় চিত্র-বিচিত্র শামুক বেচিয়া বেড়াইতেছে। সেগুলি দেখিতে এত সুন্দর যে, মনে হয় ঠিক যেন গজদন্ত নির্ম্মিত সাদা সাদা ফুল। এই প্রবালগুলি ক্রমবিকাশ-পর্য্যায়ে জেলি মাছ হইতে এক স্তর উচু, শুধু দেহনল নয়, ইহাদের দেহে খাদ্যনলও সংযুক্ত আছে। দামও অতি অল্প। এক ডলার দিলে নানা রকম রঙ ও আকারের এক ঝুড়ি প্রবাল পাওয়া যায়। আমি অনেকগুলি কিনিয়া আনিয়াছি ও আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিয়াছি।

সিঙ্গাপুর দ্বীপটীর উপকূলের অর্দ্ধেক অংশ ক্রমিক জেটী দিয়ে বাঁধান। এসকল স্থানে বাহাদুরী কাঠের অভাব নাই। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ দিয়ে জেটী প্রস্তুত। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য এত বেশী যে, জাহাজ একবারে জেটীতে লাগিয়া মালপত্র নাবাইয়া না দিলে বা বোঝাই না নিলে চলে না। যতদূর চক্ষু যায়, জেটীতে সারি সারি জাহাজ বাঁধা রহিয়াছে। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের জাহাজ জেটীতে ভিড়ান হইল। চীনেম্যান কুলি, কুলির সরদার, কেরাণী ইত্যাদিতে জেটী পরিব্যাপ্ত। সবই চীনেম্যান। মাংসপেশী বহুল সুগঠন অৰ্দ্ধনগ্ন দেহে তাহারা অকাতরে ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া মাল নাবান-উঠান কাজ করিতেছে। জেটীর পাশেই বিস্তৃত আয়তন ঢেউতোলা টিনের গুদাম-ঘর। তার ভিতর হইতেই ছোট ট্রেণযোগে মালপত্র সহরের ভিতর নীত হইতেছে। তার নিকটেই পাথুরে কয়লার স্তূপ! বহুদূর ধরিয়া পর্ব্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হইয়াছে। যেন সমুদ্রের ধারে বরাবর একটী অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলিয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুর জাহাজে কয়লা লইবার একটী প্রধান জায়গা.

জাহাজের জন্য পাথুরে কয়লা বোঝাই হইবার স্থান। এ অঞ্চলের সকল জাহাজই এখানে থামে। জাপান যাইবার জাহাজই হউক, আর চীন যাইবার বা অষ্ট্রেলিয়া যাইবার জাহাজই হউক,—সকল জাহাজই এখানে আগে লাগে ও এখান হইতে কয়লা ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বোঝাই লয়। সিঙ্গাপুর যে কেবল বড় ব্যবসার স্থান বা কয়লা বোঝাই হইবার আড্ডা, তাহা নয়; এ স্থানটি অতি সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত। এখানে একটী কেল্লা আছে, তাহা অতি সুকৌশলে গঠিত ও দুর্জ্জেয়।

সিঙ্গাপুরের আবহাওয়া অতি সুন্দর। বিষুবরেখার অতি সন্নিকট, সুতরাং এস্থানটি খুব গরম হইবারই কথা; প্রকৃতপক্ষে এখানে কিন্তু বেশী গরম পড়ে না। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সকল স্থানেই যেমন বেশী শীত বা বেশী গরম হয় না, এখানেও সেইরূপ। এখানে প্রায় সারা বছর ধরিয়াই একরূপ নাতিশীতোষ্ণ ঋতু বিরাজ করে। এখানে বর্ষাকাল বলিয়া কোনও কাল নাই। বৃষ্টি সারা বছরই মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

যেখানে এমন চিরবসন্ত বিরাজমান, সেই স্থানের সেই ছোট ছোট পাহাড়ের উপরকার ছোট ছোট বাংলাগুলির দিকে চাহিলেই আমার মনে হইত,—যে ভাগ্যবান পুরুষেরা ঐ স্থানে বাস করেন, তাঁহারা কত সুস্থ শরীরে কত মনের সুখে থাকেন। উন্মুক্ত বিমল বাতাস দিবারাত্রি বহিতেছে। কলিকাতার ঘন অবস্থিত ধূলি ও ধূমসমাকীর্ণ বাড়ীর তুলনায় এবাড়ীগুলি ত স্বর্গপুরী। অনন্ত সুনীল সমুদ্র চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে ও পূর্ণিমার বিমল আলোকে সমুদ্র-বক্ষে নভোমণ্ডলের প্রতিবিম্ব পড়িয়া কতই না জানি শোভা হয়।

সিঙ্গাপুর।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

জাহাজও জেটীতে লাগিল আমিও জাহাজ হইতে নামিলাম। জেটীতে লাগে বলিয়া, এ সকল স্থানে জাহাজ হইতে নামা-উঠার কোনও গোলমাল নাই। রেঙ্গুনের মত সাম্পানের সাহায্য লইতে হয় না। নামিয়া আর দুই পা' গেলেই অসংখ্য রিক্স (ঠেলা গাড়ী) পাওয়া যায়; সুতরাং এ সকল স্থানে ভ্রমণ করার বিশেষ সুবিধা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘণ্টায় দুই জনার ৩০ সেণ্ট মাত্র ভাড়া;—রিক্সগাড়ী ঘোড়ার গাড়ীর মত বেগে চলে; সুতরাং অতি অল্প সময়ে ও অতি কম খরচে সকল স্থান দেখা যায়।

প্রতি সাগর বা প্রণালীতে প্রবেশের পথেই ইংরাজ অধিকৃত একটু না একটু স্থান আছেই। সমুদ্রের উপর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এরূপ আবশ্যক। এক সিঙ্গাপুরই কতদিকের পথ আগুলিয়া আছে। চীন, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া যাইবার পথে সকল জাহাজকেই এখান দিয়া যাইতে হয়। শুধু এখানে নহে, ভূমধ্য সাগরের প্রবেশের পথ জিব্রালটার হইতে দেখিয়া আসিলে, সর্ব্বত্রই এরূপ দেখা যায়। ভূমধ্য সাগরের মধ্যপথে মাল্‌টা দ্বীপ ইংরাজ অধিকৃত। মিসর দেশ ইংরাজেরই ক্ষমতাধীনে; ইহা ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সমুদ্রে প্রবেশের পথে অবস্থিত। লোহিত সমুদ্র হইতে বাহির হইবার পথেই এডেন-বন্দর। তার পর ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশ ত ইংরাজেরই করতলগত। মালয়-প্রণালীর পথে পিনাঙ ও সিঙ্গাপুর এবং চীন-সমুদ্রের একদিকে লাবুয়ান দ্বীপ এবং অপর দিকে হংকং দ্বীপ ইংরেজাধিকৃত।

শেষোক্ত এই অধিকারগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা জমির খানিকটা অংশ ও তাহার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত। পিনাঙ একটী দ্বীপ ; কিন্তু নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডের অংশটুকুর নাম ওয়েলেশলী টাউন। এইরূপ সিঙ্গাপুরও একটী দ্বীপে অবস্থিত ; কিন্তু নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডকে মালাক্কা বলে। যতগুলি প্রধান আড্ডা আছে, তাহা দ্বীপেই অবস্থিত। বিদেশে দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং,—সবগুলিই দ্বীপ। ভূখণ্ডস্থ জমি, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক। সেই স্থান হইতেই রেলযোগে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যাদি দেশের ভিতর নীত হয়।

বহুপূর্ব্বে এই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে পর্ত্তুগীজদের ক্ষমতাই প্রবল ছিল। তাহাদের হাত হইতে ওলন্দাজেরা অনেক স্থান কাড়িয়া লয়েন এবং অনেক স্থান আবার ইহাঁদের হাত হইতে ইংরাজ, ফরাসী, জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতির হাতে গিয়াছে। এইরূপে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বিদেশীয় জাতির মধ্যে ভাগাভাগী হইয়াছে।

নামিয়াই প্রথমে জেটীতে খানিক পরিভ্রমণ করিলাম। ক'ত মাইল উহা লম্বা, তাহার আমি শেষ পর্যন্ত যাইতে পারিলাম না। চীনে-কুলির ভিড় ও মালপত্র নামানর গোলমালে তাহার উপর দিয়া যাতায়াতও সহজ নহে। চীনে কুলি অতি সুদক্ষ, তাহারা নিঃশব্দে কাজ করে। জিনিষপত্র ফেলা বা ভাঙ্গা-চুরা কদাচ ঘটিয়া থাকে। কলিকাতার কুলি বা রেঙ্গুনের মাদ্রাজী কুলি কত রকম সুর করিয়া গান করে। ইহাদের মুখে কিন্তু কোন শব্দই নাই। যতক্ষণ কাজ করিবে, ক্ষণেকের তরেও ইহারা একবার বিশ্রাম করে না, কেবল ঠিক আহারের সময় ফিরিওয়ালার কাছ হইতে ভাত-তরকারী কিনিয়া খাইবার জন্য স্বল্পক্ষণ ছুটী পায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রমের মূল্য অধিকাংশ স্থলেই ২০ বা ৩০ সেণ্ট অর্থাৎ ৫ আনা মাত্র। বেশী লোক বলিয়া

চীনদেশে মজুরী এত সস্তা। তাই চীনেম্যানরা মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এত ছড়িয়ে পড়েছে; ও ভারতবর্ষ, ও দক্ষিণ আফরিকা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য চীনেম্যান কারিকর ও কুলির কাজ করিবার জন্য যাইতেছে বাণ্ড স্বর্ণখনির জন্য বহু চীনে কুলি চালান হয়। তাহারা সব ৶৹ আনা রোজে যাইতেছে। জাহাজের আফিসের লোকেদের নিকট হইতে খবর পাইলাম যে, এক একটা চীনে কুলি চারিটি ভারতবর্ষীয় কুলির কাজ করে। সুতরাং হিসাব মত কত সস্তা পড়িল। প্রকৃতই দেখিলাম,

নারিকেল নিকুঞ্জে রিক্স গাড়ী।

রেঙ্গুনে যে সব বস্তা দুটী তিনটী ক্ষীণদেহ মাদ্রাজী কুলিতে গান

গাহিতে গাহিতে মুখভঙ্গী করিয়া তুলে ও ফেলিয়া জখম করে, এক একটী চীনে কুলি অবলীলাক্রমে তাহা বহন করিয়া থাকে। কিরূপ দ্রুতবেগে ও কতকক্ষণ ধরিয়া ইহারা যাত্রীসহ রিক্স গাড়ী টানিয়া লইয়া বেড়ায় তাহা দেখিলে তাহাদের কত যে ক্ষমতা তাহা বুঝা যায়। বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে যাইবার কালে ঘন ছায়াযুক্ত বড় বড় নারিকেল-নিকুঞ্জের ভিতর দিয়া সুগঠন চীনে রিক্স ওয়ালা দ্বারা যখন তীব্র বেগে আমাদের রিক্স গাড়ী নীত হইতেছিল, সে স্থানে—সে সময়কার আমার মনের অনন্দ ভাষায় বুঝান যায় না।

এই পরিশ্রমের সহিত তাহাদের আহারের তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দিনে—তিনবারে ৬ পেয়ালা মাত্র ভাত-তরকারী ও অতি সমান্য মাত্র মাংস ও কিছু মাছ খাইয়া ইহাদের দেহ কেমন করিয়া এত পুষ্ট ও বলবান থাকে, তাহা বুঝা যায় না। আমার মনে হইল, আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা দুই বেলায় অন্ততঃ ইহাদের একজনের দৈনিক আহারের দুই তিন গুণ আহার করে। অল্প আহার ও কায়িক পরিশ্রমে এবং মনের চিরপ্রফুল্লতাতেই ইহাদের শরীরে বলাধান করে। সু-হজমের যে সব লক্ষণ, তার সব গুলিই এদের ভিতর দেখা যায়। এরা ঘুমাবে একেবারে অকাতরে,—ঠিক যেন মৃত ব্যক্তির মত। মাদুরে শুয়ে এবং বাঁশ বা কাঠের বালিশ মাথায় দিয়ে যে অবস্থায় শুইবে, সেই অবস্থায়ই উঠিবে—একবারও পাশ ফিরে না। এদের প্রতিদিন মলত্যাগের প্রথা নাই,—তিন চার দিন অন্তর, যখন আবশ্যক হইবে, তখন যাইবে। আর সে দাস্তও যত সুহজমব্যঞ্জক হইতে হয়। বায়ুর প্রাচুর্য্য বা তরলতার লেশ মাত্র তাহাতে নাই। অতি অল্পমাত্র সময়ে ইহাদের মলত্যাগ সমাধা হয়।

এদের পোষাক ঢলঢ'লে ইজের ও কোট; তবে কেহ কেহ গা' খুলিয়াও কাজ করে। চীনজাতি বড় নীলরঙ প্রিয়। তাদের পোষাক

নীলরঙের, সাম্পান নীলরঙের, বাড়ীগুলিতে নীল রঙ মাখান ও সাইন্‌বোর্ডগুলির হয় জমি না হয় হরফ নীল রঙের।

এদের সুহজমের কারণ কি ও এমন সুগঠন মাংশপেশীবহুল দেহে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের কুফলই বা কি,—সে সব কথা বিস্তৃতরূপে পরে বলিব। তাহা হইতে আমাদের দেশের লোকের অনেক শিখিবার আছে। তবে এই টুকু মাত্র এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, চীনেদের ভিতরে হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাব বড়ই দেখা যায়। পিনাঙ প্রবন্ধে রিক্‌স ওয়ালার কথায় বলিয়াছি যে, দশ বার বৎসর এরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহারা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুলি ও নৌকার মাঝিরও সেইরূপ। হৃদ্‌রোগই এরূপ মৃত্যুর কারণ।

প্রত্যহ দিনের কার্য্য শেষ হইলে চীনে কুলিরা সমুদ্রে গা'ধুইয়া থাকে; কিন্তু মাথায় জল দেয় না,—পাছে বিনানীতে লোণা জল লাগে ও চুল ভিজিয়া যায়! মধ্যে মধ্যে আপনাদের কাপড়গুলিও কেচে দেয়। মাথা ধুইবার জন্য আলাহিদা দোকান আছে, সেখানে গরম জল ও সাবাঙ দিয়া মাথা ধুইয়া চুল বিনাইয়া দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফিরিওয়ালারা ভাত, মাছ, মাংস, তরকারী ইত্যাদি বেচিয়া বেড়ায়। কোনও কুলিকে রেঁধে খেতে হয় না। দিনে তিন বার খাইবার খরচ ১২ সেণ্ট মাত্র। কাপড় জামা ছিঁড়িয়া গেলে চীনে ফিরিওয়ালী স্ত্রীলোক দুই এক সেণ্ট লইয়া তাহা রীপু করিয়া দেয়। শুইবার জন্য এদের একটী মাদুরি ও একটী কাঠের বা বাঁশের বালিশ মাত্র দরকার হয়। এরা কখনও আহারের সময় জলপান করে না, অথবা কখনও সরবৎ বা ঠাণ্ডা জল পান করে না। আবশ্যক মত ছোট ছোট পিয়ালায় স'বজে চা খায়; তাতে চিনি বা দুধ দেয় না। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই ফিরিওয়ালারা সেই স্থানে আনিয়া যোগায়; সুতরাং তাদের কাজের ভাবনা ছাড়া আর কোনও ভাবনা ভাবিতে হয় না।

সিঙ্গাপুর প্রবন্ধে চীনেম্যান সম্বন্ধে বেশী কথা বলার আমার ইচ্ছা ছিল না; সে কথা হংকং, এময় প্রভৃতি চীন দেশীয় স্থান সম্বন্ধে বলিলেই ভাল হইত। তবে মালয় দেশ ও তথাকার আদিমবাসী সম্বন্ধে পিনাঙ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছি আর ইহাও বলিয়াছি যে, এ সকল দেশে শতকরা ৯০ জন চীনেম্যান বাস করে। যদিও দেশটী মালয়-উপদ্বীপ বটে, কিন্তু চীনে অধিবাসীই বেশী ও ব্যবসাদি-সূত্রে তাহারাই প্রধান। এই কারণে চীনেম্যানের কথা আপনিই আসিয়া পড়িল। বিশেষ সিঙ্গাপুরের মত একটী প্রধান বন্দরে বিপুল জেটীর কথা বলিতে বলিতে চীনে কুলির কথা না বলিলেই নয়।

জেটীতে কত বিভিন্ন প্রকার মালপত্র দেখিলাম। রেঙ্গুন হইতে আনীত চালের বস্তা ঠাসা রহিয়াছে। আমরা আবার আরও কতকগুলি চালের বস্তা নামাইয়া দিলাম। বাহাদুরী কাঠ, লোহার কড়ি, করুগেটেড আয়ারণ, অনেক বিলাতী কাপড়ের গাঁট ও অন্যান্য নানা রকমের বিলাতী দ্রব্যাদি নামিল। জেটীতে অধিকাংশই বিদেশী পণ্যদ্রব্য। জাপানী দেশলাইয়ের অসংখ্য বড় বড় বাক্স এখান হইতে চালান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে রেঙ্গুন, পিনাঙ প্রভৃতি দেশে নীত হইতেছে। আপকার কোম্পানীর জাহাজেই সর্ব্বাপেক্ষা ভিড়। চীনদেশে মালপত্র বা লোকজন নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা সম্বন্ধে আপকার কোম্পানীর জাহাজই প্রধান।

সহরের ভিতর ঢুকিয়া যতদূর দেখিলাম, সমস্ত সহরটী কেবল দোকানে পরিপূর্ণ। লোকে লোকারণ্য, তার অধিকাংশই চীনে। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এখানে ব্যবসাসূত্রে আসিয়াছে। সকল লোককে দেখিলেই মনে হয় তাহারা অস্থায়ী, কেবল ধন লুটিতে আসিয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আমেরিকাবাসীই বেশীর ভাগ। বিস্তর ফরাসীও আছে, তাহারা মদের দোকান বা থিয়েটার বা কেশ পারি-

পাট্যের দোকান করে, কেহ বা হোটেলের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার। তাহারা দোকানে অতি সুন্দর সুন্দর মোম নির্ম্মিত অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি রাখিয়াছে।

এদেশের লোক সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষ করিয়া বলা উচিত। ইউরোপীয় ও চীনে মিশ্রিত একরূপ সঙ্কর জাতি এ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। তাদের নাসিকা উন্নত, কিন্তু গালের হাড় উচু ও চোক বাঁকা। তারা অনেকেই সাহেবদের মত পোষাক পরে; আবার অনেকে ঠিক চীনেম্যানের মত ঢল ঢ'লে বেশ করিয়া থাকে। আর কতকগুলি আছে, তাহারা ইউরোপীয়ানদের মত আঁটা সোটা পোষাক পরে বটে, কিন্তু টুপির ভিতর চীনেদের মত বিনানীও লুকাইয়া রাখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—চীনেম্যান যেখানে যায় সেই খানেই বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন করে। ইউরোপীয় জাতি ও মগজাতির সঙ্গে, এমন কি কলিকাতার চীনেপাড়া বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটেও অনেক চীনেম্যানের ঔরসে এবং ফিরিঙ্গীর মেয়েদের গর্ভে অনেক দো-আসলা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফরিকার উপনিবেশ-সমূহে চীনেকুলি আমদানি করিতে যে আপত্তি, তার একটী কারণ,—এইরূপ দো-আসলা জাতির সৃষ্টির ভয়।

এ ছাড়া অনেক জাপানদেশীয় লোক, ইহুদি ও পার্শী এখানে বড় বড় দোকান করিয়াছে। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই শিখ পাহারাওয়ালা দেখা যায়। তাদের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যেন শান্তি-রক্ষা চলে না। বেছে বেছে ভীমাকৃতি শিখ আমদানী করা হয়েছে। অধিকাংশই দেখিলাম ৬ ফুটের উপর ঢেঙ্গা। তাহারা রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া শান্তি রক্ষা করিতেছে। খর্ব্বাকৃতি মালয় পুলিস তাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া হুকুম তামিল করিতেছে। শিখ পাহারা-ওয়ালাকে সেখানে সকলেই যমের মত ভয় করে। দোষীর বিচারও

তাদের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। গালি, ঘুষি, চপেটাঘাত, যষ্টিপ্রহার ও চীনেদের বিনানী ধ'রে টানিয়া উৎপীড়ন,—ইহা প্রায়ই দেখা যায়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড সচরাচর হইয়া থাকে। শিখ পাহারা-ওয়ালা একবার হাঁক দিলেই হ'ল—সকল লোকই ভয়ে কাঁপে। আমরা তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কহিলে, তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। দেশের লোক দেখিয়া তাদের যেন আত্মীয়তার স্পৃহা জাগিয়া উঠিত। চীন রিক্‌সওয়ালাকে আমাদিগকে দেখাইবার স্থান সকল বুঝাইয়া দিত, এবং আমাদের যেন কোনও বিষয়ে অসুবিধা না ঘটে, সে সম্বন্ধেও শাসাইয়া দিত। এখানে মাদ্রাজীরও অসদ্ভাব নাই। তারা অনেকেই সাহেবদের চাকরী করে; অনেকে স্বাধীনভাবে নিজে নিজে দোকান করিতেছে।

আর স্ত্রীলোকের ত সংখ্যা নাই। এত স্ত্রীলোক কোথাও কখন দেখি নাই। যত বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এখানে জুটিয়াছে, তার মধ্যে জার্ম্মাণদেশীয় ইহুদী ও জাপানী স্ত্রীলোকই বেশী। তাহারা যেখানে থাকে সে পথ দিয়া চলিলেই "আপনার সঙ্গে একটী মাত্র কথা কহিতে চাই" স্ত্রীকণ্ঠ উচ্চারিত এই কথাগুলি অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের অনেক স্থানে কেবল তাদেরই বসতি। সেই স্থানেই থিয়েটার, সেই স্থানেই হোটেল, সেই স্থানেই মদের দোকান। সারারাত্রি দিনের মত জনতা। ঘুরে ঘুরে বড় পিপাসা হওয়ায় চীনে রিক্সওয়ালাকে অঙ্গভঙ্গী করিয়া,—সঙ্কেতে বুঝাইয়া দিলাম যে জল খাইতে চাই। সে মদের দোকানে নিয়ে গেল। তারাই ২০ সেণ্ট বা ৫আনার বিনিময়ে লেমনেড ও বরফ খাওয়াইল। একটী ফরাসী রমণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি খানিক ক্ষণের জন্য উপরে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিবেন না?" সে স্থলেও চীনে স্ত্রীলোকের গাম্ভীর্য্য যায় নাই, চারিদিকের সাজ-সজ্জা শব্দবিন্যাস ও অঙ্গ-বিভ্রমের মাঝে তাদের গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে।

বাড়ীগুলি সব তিন চারিতলা উচু। সর্ব্বোপরের ছাত ঢালু। গায়ে গায়ে গাঁথা—সবগুলি এক রকম দেখিতে ও অধিকাংশই নীল রঙ মাখান। নীচে দোকান; উপরে থাকিবার আড্ডা। দোকানের সামনে নীলরঙের সাইনবোর্ড ঝুলচে। চীনে হরফগুলি নীচে নীচে লেখা,—দেখিতে ঠিক যেন ঘর বাড়ীর মত। প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই ঢাকা বারান্দা। সব বাড়ীর বারান্দাগুলিই সংযুক্ত; সুতরাং তার ভিতর দিয়া যেন একটা ঢাকা ফুটপাথ হইয়াছে। বরাবর যাইলে মাথায় রৌদ্র বা বৃষ্টির ছাঁট লাগে না।

রাস্তায় রথযাত্রার মত ভিড়। দ্রুতবেগে রিক্স গাড়ী প্রভৃতি অনবরত যাতায়াত করিতেছে। এমন কি কলিকাতা হইতে গিয়াও আমাদের ভ্যাবাচেকা লাগিত। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র হইতে এক একটা খালকাটা হইয়াছে, তাহা দিয়া কত নৌকা মালপত্র আনিয়া একবারে দোকানের কাছে পৌঁছাইয়া দিতেছে। জলের উপর দিয়া বহিয়া আনিবার খরচ জমির উপর দিয়া আনার খরচের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এখানে ভাল ভাল ডাক্তারখানা আছে,—কিন্তু খুব ভাল ডাক্তার নাই। বড় লাইব্রেরী নাই; যাহা আছে, তাহা নভেলে পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় নাই,—উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানে এত ঘন বসতি যে সমস্ত সহরটীতে, রেঙ্গুন ও পিনাঙের মত একটীও বড় উদ্যান বা মন্দির দেখিলাম না। ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে বটে কিন্তু তাহা ছোট ও তাহার চারিদিকে বসতি। সহরের অনেক দূরে, শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মত, বটানিকাল গার্ডেন আছে। সেখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। তার নিকটে কোথাও বসতি নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ; যেন পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। সেখানকার স্বচ্ছ সরোবরে "ভিক্টোরিয়া রিজিয়া" (রাণী ভিক্টোরিয়া) নামক আমাদের পদ্ম জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড

আকৃতিবিশিষ্ট শতদল ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া থাকে। কোন কোনটীর ব্যাস দেড় বা দুই ফুট হইবে। ঐ পদ্মের পাতাগুলিও অতি প্রকাণ্ড। দেখিলে মনে হয়, এরূপ পদ্মের উপর বীণা বাজাইয়া নাচা কিছু অসম্ভব নহে। আর সেখানকার সোজা লম্বা নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্জবন,—ঠিক যেন বেতসকুঞ্জের মত। বট ও অশ্বত্থ গাছ অপেক্ষাও প্রকাণ্ড ছায়া-তরুর তলায় বেলা দ্বিপ্রহরে বসিলে আর উঠিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরাগত পাখীর গান ঠিক যেন দূরাগত বংশীধ্বনির মত শ্রুতিসুখকর। মাথার উপরে, গাছের ঘন পাতায় লুকাইয়া একটী পাখী করুণস্বরে ডাক্‌'ছিল। আর যেন আমারই জীবনের অতীত ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাষায় ব'লছিল।

মালয়-পল্লীদৃশ্য।
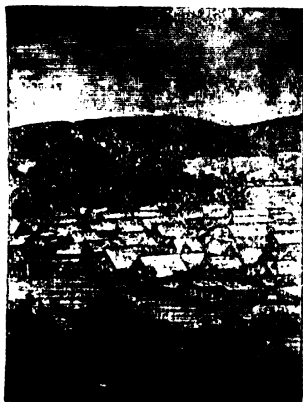
সেখান হ'তে ফিরতে আমার প্রায় সন্ধ্যা হ'ল। আসিবার পথে সহর হইতে অনেক দূরে মালয়পল্লী দেখিলাম। ছোট ছোট পাহাড়সমাকুল একটী স্থানে ঐ পল্লী অবস্থিত। কাঠের বাড়ীর ঢালু চালাগুলি বহুদূর অবধি, ক্রমান্বয়ে চলিয়াছে। সেই সকল গাছ-পালা সমাচ্ছন্ন পাহাড়েরই পাদমূল ধৌত করিয়া

সমুদ্রের জল কুল-কুল রবে জোয়ারভাটা খেলে। কতপ্রকার শামুক ও জলজ প্রাণীর চিত্র-বিচিত্র খোলা তথায় দেখিলাম; ঢেউয়ের সহিত তীরের দিকে উঠিতেছে ও নামিতেছে। পল্লীর ছোট ছেলেগুলি সমুদ্রজল থেকে সেই সকল কুড়িয়ে গুলি ছোড়াছুড়ি করে। আর ছোট মেয়েরা ভিজে বালি দিয়ে খেলাঘর প্রস্তুত করে,—মুক্ত হাওয়ায় সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে সময় কাটায়। তাহাদের বয়স্কা বোনেরা বনফুলের মালা গেঁথে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। সে মালার তলা দিয়ে দিবাবসানে যে চলে, তারই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাদের এইরূপ বিশ্বাস।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আমাদের জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা ভীষণ চীন-সমুদ্রে বহুদিনের জন্য ভাসমান হইলাম।

চীন সমুদ্র।

সিঙ্গাপুর হইতে হংকং সতেরশো ষাট মাইল দূর। তথায় পৌঁছিতে ছয় দিন লাগে। সিঙ্গাপুর হইতেই চীন সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে। হংকং হইতেও অনেক দূর অবধি এই চীন সমুদ্র বিস্তৃত; সুতরাং সারা পথই চীন সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। যখন জাহাজ সিঙ্গাপুর হইতে ছাড়িয়া উত্তরমুখী হইল, তখন জাহাজের কর্মচারীরা বলিতে লাগিলেন, এইবার বিষম পরীক্ষার স্থল আসিবে। আমার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা বলিয়া আমি ওসকল কথার তাৎপর্য্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

এক দিন বেশ গেলাম। সুনীল সমুদ্র সে দিন ধীর-স্থির। ছয় দিন ক্রমাগত যাইতে হইবে বলিয়া সকলেরই মন স্থির ছিল। জাহাজে চীনেম্যান ও অন্যান্য যাত্রীর ঠাসাঠাসি ভিড়। অনবরত দিনরাত নানা প্রকার চীনে লোক চোখের উপর থাকায়, তাদের কার্য্যকলাপ, গড়ন-পিঠন, রীতিনীতি সকলই বেশ করিয়া দেখিবার সুযোগ হইত এবং সামান্য বিষয়টি অবধি মনোযোগের সহিত দেখিতাম ও নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতাম।

নূতন নূতন নানা দেশ, নানা প্রকারের লোকজন দেখিয়া মনে আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তারা আমাদেরই মত আহার বিহার করে দেখিয়া যেন নিকট আত্মীয় বলে মনে হতো। মনের যে অপ্রসন্ন ভাব এবং শরীরের যে অবসন্নতার জন্য সমুদ্রযাত্রা মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা দিন দিন অনেক কমিয়া যাইতে লাগিল। অগ্নিমান্দ্য ও অনিদ্রা যাইয়া বেশ ক্ষুধা ও সুনিদ্রা হইতে লাগিল। যে সকল সহযাত্রীর সহিত

অনবরত মিশিতাম, তাঁহারা কত দেশ বেড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কত ধনী সওদাগর ছিলেন। কেহ কেহ বা ভ্রমণকারী কর্ম্মচারী,—বহু দিন ধরিয়া ও অঞ্চলের সকল দেশে ঘুরিতেছেন। কোন্ জিনিষের কোথায় কত দাম, কোন্ দ্রব্য কোথা কত সস্তায় উৎপন্ন হইতে পারে, কিরূপ বস্ত্র কোথায় আবশ্যক, ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আজীবন দেশে দেশে ফিরিতেছেন। অর্থোপার্জ্জন কি সহজে হয়? তাঁহাদের সহিত সদা সর্ব্বদা বসিয়া সেই সকল বিষয়ের ও নানা দেশের কথাবার্ত্তা হইত। তাহার মধ্যে অনেক ধনী চীনে সওদাগর ও অপর ধনী লোকও ছিলেন। চীনেরা ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। খুব কম লোকই চাকরীর জন্য লালায়িত। তাঁহারা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের দেশ ও তথাকার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক খবর পাইতাম। জাপানী, ইহুদী, পার্শী, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান ভদ্র স্ত্রী-পুরুষও অনেক ছিলেন। সুতরাং জনতাপূর্ণ সহরে থাকিলে যেমন সঙ্গীর অভাব হয় না, জাহাজেও সেইরূপ বেশ আনন্দেই সময় কাটিত।

তখন শুক্ল পক্ষ। যে দিন জাহাজ ছাড়ে, তার পর দিনই পূর্ণিমা। সন্ধ্যা ৭ টার সময় ডিনার হইত। তার পর সকলে ডেকের উপর আরাম-কেদারায় বসিয়া নির্ভাবনায় জ্যোৎস্নাপুলকিতা শুভ্র-যামিনীর সৌন্দর্য্য দেখিতাম ও উন্মুক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতাম। নীল সমুদ্রজলের উপর শ্বেত ফেনপুঞ্জ যেন কিশলয়ের উপর রাশীকৃত ফুলের মত মনে হইত। এখানকার লোণা জল রাত্রিতে জোনাকের মত জ্বলে। স্থির সমুদ্রে জাহাজ যখন ঈষৎ দোলে, তখন বড়ই আরাম বোধ হয়; মনে হয়, আস্তে আস্তে ঘুম পাড়াবার জন্য কে যেন কোলে করিয়া দোলাইতেছেন।

কিন্তু সেই পূর্ণিমার নিশায় পশ্চিম আকাশে মেঘ উঠিল; বায়ুও

জোরে বহিতে লাগিল ; জাহাজও বেশী বেশী দুলিতে লাগিল। পরে আর ডেকে থাকা গেল না। ক্যাবিনে যাইয়া শুইলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, প্রকৃতির শান্তময়ী মূর্ত্তি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রবক্ষ অদ্য তেমন স্থির নাই, তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ। জাহাজ আর আগেকার মত মৃদুমন্দ দোলে না,—ভীষণ বেগে তরঙ্গের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ডেকের উপর নিরুদ্বেগে বসিবার যো নাই, হাওয়ার এমনই জোর। তরঙ্গগুলি বিষম বেগে জাহাজের গায়ে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। সে শব্দও অতি ভয়াবহ।

ক্রমে জাহাজ যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, হাওয়ার জোর ও তুফান ততই বাড়িতে লাগিল। আরও এক দিন যাওয়ার পর দেখিলাম, আকাশ বাতাস ও সমুদ্রের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, ডেকে আসা দূরে থাকুক, খাড়া হইয়া দাঁড়ান ও চলা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইল। এক একটী ঢেউ পঞ্চাশ ষাট ফিট উচু। উহার উপর জাহাজখানি উঠিতেছে ও পরক্ষণেই সজোরে পড়িতেছে। জাহাজের এপাশ হইতে ওপাশ ধৌত করিয়া ঢেউ চলিয়া যাইতেছে। ঢেউয়ে কতকগুলি আহারের জন্য রক্ষিত ভেড়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। জল ঢুকিবে বলিয়া ক্যাবিনের ক্ষুদ্র জানালাও বন্ধ করা হইল। সেখানে থাকিলে গরমে ও বমির উদ্বেগে বিশেষ কষ্ট হয়। এরূপ স্থলে অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈঠক-কুঠারীতে গিয়া আশ্রয় লয়। জাহাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া সেই স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা কম দোলে। পিছনের প্রথম শ্রেণীতে সে সময়ে অবস্থিতি করা অতি কষ্টকর। তাই আজ-কালকার নূতন ফ্যাসানের অনেক জাহাজে প্রথম শ্রেণী মাঝেই অবস্থিত।

সমুদ্রের এরূপ ভীষণ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিতে লাগিল। সকলেই, বিশেষ নূতন সমুদ্রযাত্রীরা সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা প্রথমে আহার ছাড়িলেন ও

শয্যাশায়িনী হইলেন। সকলেই প্রায় অল্প-বিস্তর পীড়াক্রান্ত হইলেন। কেহ উঠে না, চলে না, নিজ স্থান ছাড়ে না,—যেখানে সেখানে বমি করে। যখন তখন বমির শব্দ; কেবল কষ্টপ্রদ বমির চেষ্টামাত্র,—উঠে অতি কম। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘরে ৩৩ জনের আসনের এগারটি মাত্র আসন ভর্ত্তি, তার মধ্যে ৭ জন জাহাজের উচ্চ কর্ম্মচারী অভ্যস্ত বলিয়া তাঁদেরই কেবল সামুদ্রিক পীড়া হইল না। অন্য সকলেই অল্প-বিস্তর ভুগিল। আর লেখক নিজে কাতর হইয়া একেবারে নিরম্বু উপবাসে প্রায় তিন দিন পড়িয়াছিলেন। সে যাতনার কথা বর্ণন করা যায় না। তবে অল্পদিনেই তাহা সহ্য হইয়া যায়, তাই রক্ষা; নইলে সমুদ্রযাত্রা অসম্ভব হইত।

সামুদ্রিক পীড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর চীনেম্যান যাত্রী মারা যাইতে লাগিল। প্রত্যহ দুই একটী করিয়া মৃতদেহ সমুদ্রবক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আশ্চর্য্য এই যে, চীনেম্যান ছাড়া অন্য জাতীয় যাত্রী একটীও মরিল না। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাসে বলিয়াছি। চীনেম্যানদের মধ্যে হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাব বড়ই বেশী। তাদের হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। অহরহ বমির বেগ তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয় সহ্য করিতে না পারায় হঠাৎ মৃত্যু ঘটিত। দেখা যাইত, কেহ বা আপনার কাপড়ের সিন্দুকের উপর শুইয়াই মরিয়া আছে, কেহ বা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ,—সারা জীবন বিদেশে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী যাইতেছিল। নিজের দেশে মৃত্যু চীনেম্যানের বড়ই প্রার্থনীয়; দেশের উপর তাদের এতই ভালবাসা। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের উপর অনেকেরই তত ভালবাসা নাই। গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে দুই শ্রেণীর জন্তু দেখা যায়। কুকুর ও ঘোড়া মানুষ চেনে,—আবাস-স্থানের উপর তত বেশী অনুরক্ত নহে। প্রভু যেখানে যায় অকাতরে অনুগমন করে। কিন্তু গরু

বিড়ালের ব্যবহার অনুরূপ। তাহারা ঠাঁই চেনে, লোক তত চেনে না। গৃহ অধিবাসী শূন্য হইলে তাহারা সেই খানে থাকিতে ভাল বাসে। চীনেরা এ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তাই স্বদেশপ্রিয় হইলেও ভাই মরিলে ভাই কাঁদে না। তাহার দুরবস্থায় অর্থ সাহায্য করিতে চাহে না। ইহার কারণ পরে বলিব।

অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি বা হৃদ্‌রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে চীন সমুদ্রের মত ভীষণ সমুদ্রে হাওয়া খাইতে যাওয়া বড়ই ভয়ের কথা। অতিশয় বমির বেগে মৃত্যু ঘটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আমাদের জাহাজে কিন্তু বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন, এমন অনেকগুলি রোগীও ছিলেন। কেহ বা বাতের জন্য, কেহ যক্ষ্মাকাসের জন্য, কেহ অনেক দিন রোগে ভুগিয়া শরীর সারিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তাহারা প্রায় সকলেই অতি অল্পদিনেই বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। শান্ত সমুদ্রে সমুদ্রযাত্রার মত শরীরের এমন উপকার আর কিছুতেই হয় না। তবে আমাদের জাতির অসুবিধার মধ্যে আহারের একটী মহা অসুবিধা ঘটে। কেবল মাংস অরুচিকর ও অসহ্য হইয়া উঠে; উহা সুসিদ্ধ হয় না বলিয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারীও হয়। নিরামিষ আহারের মধ্যে ভাত, পাউরুটী, বিস্কুট, মাখন, জ্যাম ও ফল পাওয়া যায়; কিন্তু কোনরূপ তরকারী নাই। কৌটার দুধ ছাড়া অন্য দুধ নাই। তবে নিরামিষ আচার দিয়া ভাত খাওয়া চলিতে পারে।

চীন সমুদ্র অতি বিপদসঙ্কুল স্থান। যে কারণেই হউক, চীন সমুদ্রে বার মাসই অল্প-বিস্তর তুফান হয়; কিন্তু বৎসরের এই সময়, অর্থাৎ নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ইহা অতিশয় ভয়ানক। সমুদ্র এরূপ তুফান ও তরঙ্গ-সমাকুল হওয়ার কারণ, মৌসুম পরিবর্ত্তন। যখন বঙ্গোপসাগরে মৌসুম পরিবর্ত্তনের সময় তুফান হয়, চীনসমুদ্র তখন কতকটা শান্ত থাকে; কিন্তু এই কয় মাস অহরহ অতি

প্রবল বাতাস ক্রমাগত একদিক—অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে বহিতে থাকে বলিয়া এরূপ তুফান হয়। এরূপ সময়ে জাহাজ উলটে যাওয়া বা ডুবে যাওয়ার কোনও ভয় নাই। প্রধান ভয়, পাছে জাহাজ ঢেউয়ে উঠিবার ও নামিবার সময় তাহার হা'ল ভাঙ্গিয়া যায়। হা'ল ঘুরিলে জাহাজের গতি হয়; উহা ভাঙ্গিয়া গেলে জাহাজ অনন্যোপায়। সমুদ্রে এত ঢেউ যে, তাহা আর সেস্থলে মেরামত হইবার উপায় নাই। জাহাজ ডুবিলে হাল্কা বোটে করিয়া পালাইবার যো নাই। সে ঢেউয়ে, সে তুফানে, সে বোটও ডুবিয়া যাইবে। জলে অসংখ্য হাঙ্গর; মানুষ পড়িলেই গিলিয়া ফেলে। আর একটী প্রধান ভয়, চীন-সমুদ্রে বিস্তর নিমজ্জিত চড়া আছে।

গভীর সমুদ্রের জলের রঙ সাধারণতঃ ঘোর নীল; কিন্তু এখানে অনেক স্থানে হরিদ্রাভ; তার কারণ, জলের নীচে বালুকাময় চড়া। এই কারণেই চীন সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হোয়াংহো সমুদ্রের অর্থ হল্‌দে সমুদ্র। নিমজ্জিত চড়াগুলিতে লাগিলে জাহাজ ফুটা হইয়া যায়। আমরা যখন যাইতেছিলাম তখন "ষ্ট্যান্‌লী" নামক লণ্ডনের কোন জাহজ র‍্যাণ্ড খনির জন্য পাঁচ হাজার চীনে কুলি লইয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ একটী চড়ায় লাগিয়া ফুটা হইয়া যায়। সমুদ্রের মাঝে নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ে যাত্রীগুলিকে নামাইয়া দিয়া ও মালপত্র সব সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিয়া মেরামতের জন্য জাহাজ খানি নিকটবর্ত্তী বন্দরে চলিয়া গেল; অন্য জাহাজ আসিয়া সেই সকল লোকের প্রাণ বাঁচাইল। সে জাহাজ খানিকে ভগ্ন ও খালি অবস্থায় ফিরিবার কালে আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম। দেখিয়া জাহাজ শুদ্ধ লোকের আতঙ্কের পরিসীমা রহিল না।

চীন সমুদ্রে আর একটী বিপদের কারণ,—"টাইফুন" নামক এক প্রকার ঘূর্ণী ঝড়। জাহাজ তাহাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। জাহাজ প্রবল ঘূর্ণী বায়ুবেগে চূর্ণ বিচূর্ণ ও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ডুবিয়া যায়।

কখন কখন এরূপ সময়ে জলস্তম্ভও উৎপন্ন হয়। তাহা ধীরে ধীরে এক ধারে অগ্রসর হইতে থাকে। জাহাজ তাহাতে পড়িলে আর বাঁচাইবার উপায় নাই। এমন কি জাহাজ হইতে আধ মাইল দূরেও যদি জলস্তম্ভ আপনি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। এই কারণে জলস্তম্ভ দেখিলেই দূর হইতে গোলা মারিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। সেই জন্য এবং অন্যান্য কারণে জাহাজে কামান থাকে। যখন নিজে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, তখন এই সকল কথা মনে আসিত ও এই সকল ভয়ের দৃশ্য অহরহ মনশ্চক্ষুর সামনে জাগিয়া উঠিত। তখনই মনে হইত, এত সব আত্মীয় বন্ধুর নিষেধ না শুনে এরূপ বিপদসঙ্কুল স্থানে জেদ ক'রে এসে ভাল কাজ করি নাই। আবার দুই তিন দিন বাদে যখন সব কষ্ট দূর হ'ল, তখন সে সব যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম।

এরূপ তুফানেও চীনেম্যানেরা চাইনিজ 'জাঙ্কে' ও বড় বড় চীনে বজরা ক'রে সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়। সেগুলি খুব বড় নৌকা, কেবল পাশগুলি খুব উচু ও সামনের ও পিছনের গলুই অন্য নৌকার মত সরু না হ'য়ে চেপ্টা। নৌকায় তিনটী মাস্তুল আছে। সেই মাস্তুল-গুলিতে পা'ল তুলে দিলে নৌকা চলে। ঐ নৌকা এরূপ ভাবে গঠিত ও এমন সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত যে, অমন সমুদ্রে, অত তুফানেও তাহা ডুবে না। চীনদেশে অর্থোপার্জ্জন করা এত কষ্টকর যে, প্রাণের মমতা একেবারে ত্যাগ ক'রে চীনেরা এইরূপ অতি ভীষণ চীন সমুদ্রে সপরিবারে মাছ ধরিতে যায়। সপরিবারে কেন বলিলাম, সে কথা পরের প্রবন্ধে বলিব। আর আর্থার-বন্দর অবরোধ কালে এইরূপ চীনে জাঙ্কে করিয়াই খাদ্য সামগ্রী চুপে চুপে বন্দরে ঢুকিত।

এই স্থানে নানা জিনিষ দেখিয়া ও নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া "কূপ মণ্ডূক" অবস্থায় থাকিয়া এত দিন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই,

সেই সব ভাব আমার মনে আসিত। নানা দেশের নানা লোককে আমাদেরই মত আহার-বিহার করিতে দেখিয়া সবাইকে যেন ভাই ভাই ব'লে মনে হ'তো। হৃদয়ের চিরকাল সঞ্চিত সঙ্কীর্ণতা কত কমিয়া গেল। অর্থোপার্জ্জন যে কত চেষ্টাসাধ্য তাহা সহজে উপলব্ধি করিলাম। পৃথিবী যে কতবড় তা এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রাতে কতকটা বুঝিলাম। মানবের কায়িক শক্তি যে কত সামান্য, কত নগন্য তাও উপলব্ধি করিলাম। কেবল বুদ্ধি বলেই মানব এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে দিগ্বিজয়ী।

চীন জাহাজে যাত্রিদল

রেঙ্গুন হইতে চীন জাহাজ ছাড়িয়াছিল। জাহাজে সকল জাতীয় সকল শ্রেণীর যাত্রী। প্রতি বন্দরে কতক লোক উঠিল, কতক নামিল। একটি বাড়ীতে যেমন অনেক লোক থাকে, জাহাজেও সেইরূপ সকল যাত্রিই একত্রে কাল যাপন করিত; সর্ব্বদা দেখাসাক্ষাৎ ও মেশামিশি হইত। বিভিন্ন জাতীয় লোকদের এইরূপ একত্রে দেখিয়া তাহাদের আকৃতি ও আচার-ব্যবহারের যে সকল পার্থক্য মনে হইত, তাহা বুঝাইবার জন্য এই কয়টি ঘটনা লিখিলাম। এখানে তাহাদের প্রতি কার্য্য লক্ষ্য করিতাম। তীরে নামিয়া লোকদের দেখিলে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দেখা যায় না।

পিনাঙ্‌এ একটি চীনে বালক উঠিল, সে আমার কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে অনেক কাজে সাহায্য করিত। তার পিতা গরিব লোক, খাবার ফিরি করিত। অনেক বৎসর বিদেশে কাজ করিবার পর সপরিবারে বাড়ী যাইতেছে। ছেলেটি পিনাঙ্ মিশনরী স্কুলে বিনা বেতনে ইংরাজী পড়িতেছে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, দু'কথা বলিলেই মনের ভাব বুঝিয়া নেয়। আমি যে মুখস্থ করিয়া একটু একটু চীন ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তাই অভ্যাস করিবার জন্য ইহার সঙ্গে দুই একটি চীনে ভাষায় কথা কহিতাম। বালকটীর নাম "উসিন্"। তাহার সঙ্গে দেখা হলেই ব'লতাম,—"উসিন্ লাই চুপেং।" অর্থাৎ,—"উসিন আমার কাছে এসো। তোমাদের দেশের দুই একটি খবর ব'লে দাও।" শব্দটা ঠিক্ হইবে বলিয়া আমি আবার চীৎকার করিয়া বলিতাম, আর জাহাজ শুদ্ধ চীনেম্যানেরা হাসিয়া খুন হইত। আমি সেই সময়ে চীনে স্ত্রীলোকদের মুখের দিকে চাহিতাম, হাসিবার কথা হইলেও

তাহারা অপরিচিত লোকের কাছে হাসা ভদ্রোচিত নয় মনে করিয়া হাসিত না।

উসিনের পিতা ভাত মাছ ও তরকারী বেচিত। আর উসিনের মা আহারের সময় উসিনকে দিয়ে খাবার চাহিয়া পাঠাইত। সে স্ত্রীর খাবার দিবার সময়, যত ভাল ভাল মাছ ও মাংস খণ্ড—সব গুলি বাছিয়া বাহির করিয়া দিত। দেখিতাম, অন্যকে খাবার দিবার সময় তাহার এমন হাত উঠিত না।

একটি বৃদ্ধ চীনেম্যান একটী অল্পবয়স্কা মগ রমণীকে বিবাহ করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। সে বোধ হয়, রেঙ্গুনেই কোন কাজ-কর্ম্ম করিত, এখন বাড়ী ফিরিতেছে। তাহার অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে আছে, তাহার মধ্যে একটি দুগ্ধপোষ্য। ঐ চীনেম্যানের বৃদ্ধা মাতাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি পুত্রবধূকে মেয়ের মত যত্ন করেন, দেখিলাম। ছোট ছোট নাতি গুলি তাঁর কোলে পিঠে চড়িয়া আবদার করে। তাঁর তাতে আনন্দের আর সীমা থাকে না। আমাদের বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে এই দৃশ্য আমি রোজই দেখি। তাই তাহাদিগকে দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত। দেশে পৌছিলে জাহাজ হইতে নামিয়া তাহাদের সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। অপরিচিতকে পরম আত্মীয় করিয়া সে বর্ম্মারমণী যে আপনার দেশ আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া এই আড়াই হাজার মাইল আসিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মন বিচলিত দেখিলাম না। সেই চীনেম্যান তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া নামাইল, সেই দুধের ছেলেটিকে নিজে কোলে লইল, স্ত্রীকে একটি সামান্য দ্রব্যের ভারও বহিতে দিল না।

আমাদের চীন কমোডোরের শ্যালিকাও সেই জাহাজে ছিলেন। তাহার রং ঠিক বরফের মত শুভ্র। তাহার পা' দু'খানি সঙ্কুচিত, সুতরাং জাহাজ দুলিবার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক হইতে ক্যাবিনে

নামিতে হইলে খুব সন্তর্পণে অপরের সাহায্য লইয়া তাঁহাকে নামিতে হইত। তিনি ভাল করিয়া চলিতে পারিতেন না। কাপ্তেন একদিন কমোডোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"Commodore, ইনি কে?" কমোডোর বলিল,—"Wife's sister going to *his* husband." অর্থাৎ,—"আমার স্ত্রীর বোন স্বামীর কাছে যাচ্ছেন।" পিজন ইংলিসে his এবং her প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্ব্বনাম শব্দে কোন প্রভেদ নাই।

প্রথম শ্রেণীতে অনেক গুলি রমণী ছিলেন, তাহার মধ্যে কাহারও কাহারও বর্ণ তুষারের মত শুভ্র, চেহারা ক্ষীণ ও দীর্ঘ। চিবুক অত্যন্ত উচু ও চীনদেশীয় স্ত্রীলোকের মত কালো রেসমের পোষাক পরা। ইঁহাদের সহিত অনেক লোকজন ছিল। শুনিলাম, ইঁহারা মাঞ্চু জাতীয় স্ত্রীলোক। চীনের রাজবংশ এই মাঞ্চু জাতীয়। তাঁহারা কাহারও সহিত মিশিতেন না।

ইঁহাদের ঘরের পাশেই একটি ঘরে এক জন স্ত্রীলোক থাকিতেন, তাঁহাকে আমরা উঠিবার দিন ও নামিবার দিন মাত্র দেখিয়াছিলাম। আর কোনও দিন তিনি ঘরের বাহির হন নাই। সর্ব্বাঙ্গ সাদা পরিচ্ছদে ঢাকা—অন্য কোনও রং নাই। তাঁহার সঙ্গে একটি দাসী থাকিত। তাঁহার স্বামী, কাছে পৃথক এক ক্যাবিনে থাকিতেন। আমি যদিও তাঁহাদের খুব নিকটেই থাকিতাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও তাঁহার স্ত্রীর ঘরে যাইতে দেখি নাই। ইনি কোরিয়া দেশের স্ত্রীলোক। এমন অবরোধপ্রথা পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। বিবাহের পর স্বামী ভিন্ন কোনও পুরুষ,—এমন কি, নিজের পিতাভ্রাতাও ইহাদের মুখ দেখিতে পান না। শুনিলাম সিওলে রাত্রিকালে স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট কাগজের লণ্ঠন হাতে করিয়া পথে বাহির হয় বলিয়া পুরুষেরা রাত্রে পথে বাহির হইতে পারে না। তবুও ভাল,

এত অবরোধ সত্ত্বেও বাহিরে বেড়াইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, অন্য দেশে যে তাহাও নাই, দিনরাত ঘরে বন্ধ থাকে।

কোরিয়া দেশে প্রায়ই স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়সে বড় হইয়া থাকে। বিবাহের প্রথাও অতি চমৎকার। বর বিবাহের সময় ক'নের বাড়ী গিয়া দরজায় জানু পাতিয়া বসিয়া একটি হংসী ছাড়িয়া দেন। আমাদের দেশে পুরাকালে নলরাজার বিবাহেও দময়ন্তীর নিকট সোনার হাঁস দূতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে হংসের অন্য তাৎপর্য্য আছে। নিম্নোক্ত ঘটনা লইয়া এরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পুরাকালে একদা এক হংসমিথুন ক্রীড়ায় রত ছিল, এক ব্যাধ শরবিদ্ধ করিয়া হংসটিকে মারিয়া ফেলে। হংসী কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পর সে যতদিন বাঁচিয়া ছিল, মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে তার সঙ্গীকে খুঁজিতে আসিত ও না দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিত। দম্পতী-যুগলের প্রণয় এইরূপ প্রগাঢ় ও অবিনাশী হইবে বলিয়াই হংস লইয়া এই ঘটনার অভিনয় করা হয়। বিবাহ প্রথার ইহাই একটী অঙ্গ। হিন্দু বিবাহ যেমন শালগ্রাম নহিলে আইন সঙ্গত হয় না, হংস সম্বন্ধে সেখানেও সেইরূপ। হংস-মিথুনের এই ঘটনাটি ঠিক আমাদের রামায়ণের ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ঘটনার মত। সকল দেশেই মানবহৃদয়ের চিন্তার গতি বুঝি একই পথে প্রধাবিত।

প্রথম শ্রেণীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ইউরোপীয় ও চীনে মিশ্রিত জাতি, পূর্ব্ব-উপদ্বীপে বাস করে। ইউরোপীয়দের মত নাসিকা উন্নত, অথচ গালের হাড়ও উঁচু। ইহারা চীনে স্ত্রীলোকের মত ঢল ঢ'লে ইজের ও চায়না কোট বা বিবিদের মত গাউন কিছুই পরে না। তাহাদের পোষাক,—পরনে রেসমের লুঙ্গি ও গায়ে এক গা' গহনা। ইহারা পান সুপারি ও চুরট খায় এবং মদ্য পান করে। ইহারা খুব খাইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া দেখিতাম

চীন জাহাজে যাত্রিদল।

রাত্রিতে গুরু আহারের পরও, ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ হাত পা' ধুইবার
পূর্ব্বেই ইহারা ক্ষুধায় অধীর হইয়া রাশীকৃত মিষ্টান্ন আহার করিতেছে!
ইহারা প্রত্যূষে উঠিয়া যাহা খায়, তাঁহাতে আমি সাত দিন জীবন
ধারণ করিতে পারি!

বাল্‌তি করিয়া জল আনিতে গিয়া, একজন বলিষ্ঠকায় চীনেম্যান
জাহাজ দুলিতে ছিল বলিয়া পা' পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার
অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তবুও সে কাতর হইল না বা অন্যের সাহায্য
চাহিল না। আমাদের দেশের লোক এমন পড়িয়া গেলে, কত
লোক আহা-উহু করে। কিন্তু চীনেরা সেরূপ কিছুই করে না। অদূরে
কতকগুলি চীন ও অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহারা
যদিও প্রকাশ্যে সাহায্য করিলেন না, তবুও তাহাদের মুখে সহানুভূতি
প্রকাশ পাইল।

এক চীনেম্যান রক্ত-আমাশয়ে শয্যাগত হইয়া পড়িল। সে
উত্থানশক্তি রহিত; বন্দরে পৌঁছিলে তাহার আপনার ভাই তাহাকে
ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া
দিলাম। অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাহার সাহায্যের জন্য তাহার হাতে
একটি দুটি করিয়া তাম্র-মুদ্রা দিলেন।

ছেলের বড় অসুখ তারযোগে এই সংবাদ পাইয়া একজন ভদ্র
চীনেম্যান পিনাঙ হইতে হংকং এ তাহাকে দেখিতে আসিতেছিলেন।
তাহার সময় আর কাটে না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জাহাজের কর্ম্মচারীদের
জিজ্ঞাসা করিতেন, জাহাজ হংকং এ কতক্ষণে পৌঁছিবে। সিঙ্গাপুর
আসিয়া তারের খবর পাইলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি যত
অধীর হইবেন মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই কিন্তু দেখিলাম না;
কেবল নির্ব্বাক্ এবং ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া পড়িলেন,—চোখের জল
পড়িল না। তাঁহার শোকের কথা শুনিয়া বন্ধা দেশীয় একটি স্ত্রীলোক

আপনার ছেলেকে কোলে লইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি সে চীনেম্যানের কোনও সম্পর্কীয় লোক নহেন।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে একটি ইউরোপীয়, তাহার ভীমাকৃতি স্ত্রী ও দুইটি শিশু ছিল। মেম সাহেব অহরহ তাঁহার চীনে আয়ার সহিত কলহ করিতেন। এত চেঁচাইতেন যে, লোক জমিত। তাঁহার স্বামী Shakespearএর "Taming of the Shrew" (কুঁদুলী-দমন) নামক নাটকের "পিট্রুসিওর" মত দেখিতে খুব চেঙা ও মনের দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ঘন কাল মস্ত গোঁফওয়ালা! তিনি স্ত্রী অপেক্ষা আরও চেঁচাইয়া স্ত্রীকে খুব জব্দ রাখিতে পারিতেন। এক দিন স্ত্রী বসিয়া একটি সিল্কের বডি শেলাই করিতে করিতে আয়ার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বামী আয়ার উপরে যেন আরও রাগিয়া, চেঁচাইয়া—আয়াকে বকিতে বকিতে—টেবিল চাপড়াইয়া—কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া—তাঁহার স্ত্রী যে রেশমের জামাটি শেলাই করিতেছিলেন, সেইটি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চুপ! আপনিই সেই জামাটি মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া, নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এটি স্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য কেবলমাত্র রাগের অভিনয় বলিয়াই মনে হইল। নয় ত আয়ার উপর রাগ করিয়া স্ত্রীর জিনিষ লোকসান করিবেন কেন?

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি জাপানী ভদ্রলোক, তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে লইয়া এময়ে যাইতেছিলেন। ইঁহার বৃহৎ গালার কারবার আছে। তিন জনই এক ঘরে থাকিতেন। তিন জনে সর্ব্বদাই আমোদ-প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত। জাপানী রমণীরা সর্ব্বদাই চেঁচাইয়া কথা কহিতেন ও উচ্চ রবে হাসিতেন। কে কত ভারী, তাই দেখিবার জন্য পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুরুষটিও স্ত্রীলোকদিগকে ও স্ত্রীলোকরাও পুরুষটিকে সকলের সম্মুখে কোলে করিয়া তুলিতেন! আর আর লোক অবাক হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত

রঙ্গরহস্য দেখিত। তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সময় সময় স্ত্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলাকাটা নাইটগাউন মাত্র পরিয়া ক্যাবিন হইতে ডেকের উপর আসিতেন। একে খর্ব্বাকৃতি, তাহাতে লম্বা লম্বা কালো চুল পায়ের গুল্‌ফ অবধি পড়িত, চোখ ছোট ও গাল উঁচু বলিয়া হাসিলেই চোখ দুটি বুঁজিয়া গিয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইত; সকলেরই চক্ষু সেই দিকে ছুটিত। ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না। যেমন বালক-বালিকারা একত্র খেলা করে, তাঁহারাও তেমনি সরলমনে নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ স্বাধীন ভাবে খেলা করিতে দেখিয়া আমাদের অনেকেরই মনে কতই অযথা কুৎসিত কল্পনা আসিত।

জাহাজে আমি ছাড়া আর একটি হিন্দু পরিবার ছিল। এক ব্যবসাদার চোবে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু কন্যাকে লইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীর কালো ফুল-ষ্টকিং-পরা পায়ে রূপার অলঙ্কার ছিল; ঘাগ্‌রাটি রঙ্গিন ছিটের; নাকে নথ ও কানে বড় বড় অনেকগুলি মাকৃড়ি। তাহারা ডেকযাত্রী। আর তাহাদের পাশেই দুই জন জাপানী ও একটি জাপানী রমণী থাকিত। সেই জাপানীদের সঙ্গে দুই এক দণ্টার মধ্যে চোবের স্ত্রীর এত বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল যে, যদিও সে তাহাদের কথা বুঝিত না, তবু দিনরাত্রি জাপানীদের কাছে থাকিত। সে হিন্দীতে ও তাহারা নিজের ভাষায় কথা কহিত। তবে ভাবে, আন্দাজে অর্থের বিনিময় হইত। কথা বুঝুক বা না বুঝুক, সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে হাসিত। জাপানীরা কলা ও খাবার আনিয়াছিল, চোবের স্ত্রীকে তাহা খাইতে দিত। সে তাহা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই খাইত। চোবে নিজে কিন্তু কি সব ভাজাভুজি আনিয়াছিল, তাহাই খাইত। কাহারও ছোঁয়া খাইত না। কিন্তু চোবেকে দেখিতাম, স্ত্রীর যেন গোলামটি!

প্রথম শ্রেণীর সম্মুখে মালয় দেশীয় এক ডেকযাত্রী ছিল। সে খুব ফর্সা ও তাহার চেহারা উচ্চবংশীয় লোকের মত। মুখ বিষণ্ণ। সে সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকিত। গরীব না হইলে আর ডেকযাত্রী হইবে কেন? কিন্তু তাহার ভদ্রোচিত অভিমান ছিল। সে এক খানি বেতের ইজিচেয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া বা শুইয়া থাকিত; কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও একটী দেড় বছরের ছেলে ছিল। সকলেরই অতি সুন্দর গড়ন এবং ভদ্রোচিত ব্যবহার ও মুখের ভাব। ডেকযাত্রী স্ত্রীলোকদের থাকিবার আলাহিদা স্থান ছিল। সেইখানে তাঁর স্ত্রী ও শিশুর থাকিবার কথা, কিন্তু সে রমণী স্বামীকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। সেই চেয়ার খানির পাশে এসে সারা দিন বসিয়া থাকিত। পরস্পরে মুখে বেশী কথা হইত না, চাহনিতেই প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ পাইত। সে ছেলেটির অতি সুস্থ শরীর ও গোল গাল গড়ন। উলঙ্গ কোমরে একগাছি লাল ঘুন্শি ও মাথার মাঝে চুলে লাল ফিতা বাধা; বাকী মাথা কামান। সবে চলিতে শিখিতেছে। আধ-আধ বুলি ব'লে দিন রাত সেই ডেকের উপর ট'লে ট'লে বেড়াইত। জাহাজ শুদ্ধ লোক অনিমিষনয়নে চাহিয়া থাকিত— আমার ক্যাবিন থেকে ঢুকতে বেরুতে দেখা যাইত— সে দিক দিয়া গেলে আমার সে দৃশ্য হ'তে চোখ আর ফিরিত না। তাদের দু'জনকে দেখলেই আমার মনে হতো, তারা যেন দু'জনে সংসারে একা পড়েছে যেন, যে কোনও কারণেই হোক্, সমাজদ্বারা পরিত্যক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইটী নগররমণী একত্র থাকিতেন; তাঁহাদের সহিত কোনও পুরুষ ছিল না। খালি পাইলেই তাঁহারা আমাদের ডেক-চেয়ার দখল করিয়া বসিতেন। কাপ্তেনের কুকুরটি লইয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া খেলা করিতেন। অনেক রাত্রি অবধি একলা ছাদে বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছদ হয়ে অকাতরে ঘুমাইতেন। লজ্জার বড় ধার ধরিতেন

না। শরীরে স্বাস্থ্য ও মনে আনন্দ থাকিলে যেরূপে জীবন কাটে ইহাদের সেইরূপই দেখিতাম। অপরে কি ভাবচে না ভাবচে ভেবে আদব-কায়দার জাঁতায় জীবনকে পেষণের কোনও চেষ্টা ছিল না। বুকের উপর অবধি লুঙ্গী বাধা থাকে বলিয়া তাঁহাদের চলা ফেরা যেন আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ভাবের। জমিতে পা ঘেঁষিয়া চলিতে হয়। রেঙ্গুনে এক দিন আসিবার সময় মগের নাচ দেখিয়াছিলাম। মগরমণীদল সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই।

Fitz Geraldএর যে বিখ্যাত সার্কাস আসিয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ ইত্যাদি স্থানেও ঐরূপ খেলা দেখাইয়া আসিয়াছে। তাহারা আমাদের জাহাজেই ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হইত, নীচ শ্রেণীর ইয়োরোপীয়রা অনেকটা আমাদের দেশের নীচজাতীয় লোকেরই মত। পশুর মত আচার ব্যবহার – খাওয়া শোয়া। সুর ক'রে অঙ্গভঙ্গী করে কথা কওয়া, আর কথায় কথায় দিব্যি গালা; আর অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা করা। তাহাদের দলে যে সব স্ত্রীলোক তারে ও ঘোড়ার খেলা দেখাইত, তাহাদেরও স্বভাব সংসর্গদোষে ঐরূপ হইয়াছে।

সকল জাতির স্ত্রীলোকের তুলনায় চীনজাতীয় স্ত্রীলোককে দেখিতাম, সর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির; মুখে হাসি নাই, উচ্চ কথা নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সন্তানের যত্ন করিতেন।

দেখিতাম, যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা বিভিন্ন বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে পারিত না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছেলেরা অনায়াসে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিত। শিশু-ভাষা যেন একটি স্বতন্ত্র ভাষা, সকল শিশুই জানে, তাই তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না।

আর একটি দম্পতীর কথা বলি। স্ত্রীলো টী ফরাসী জাতীয়। প্রথম স্বামী ইঁহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিত্যাগ করেন। তারপর অনেক দিন ইনি থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন। চার পাঁচ বৎসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সওদাগর ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। দুটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়ে দুইটীর তাহাদের মারই মত চঞ্চল নীল চোখ। বিবাহের ছ'মাস পরেই প্রথম কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ সুখী হইয়াছেন। সর্ব্বদা শেলাইয়ের কাজ লইয়াই থাকিতেন। মেয়েদের যত্ন আদরের সীমা ছিল না। কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। স্বভাবের কোনওরূপ চাঞ্চল্য নাই। প্রতি কথাবার্ত্তা আচার-ব্যবহার সবই উচ্চ আদর্শের। অতীত জীবন হেয় হইলেও এখন তাঁহার প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়াছে। তার আর বৈচিত্র্য কি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না?

একটী ছোটছেলে বার বার বমি ক'রছিল ও যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে কাঁদছিল ব'লে তার বাবা আমাকে একবার ছেলেটীকে দেখাতে নিয়ে গেল। তারা গরিব ডেক যাত্রী। স্ত্রীলোক যাত্রিদের থাকিবার জন্য যে ডেক আছে, আমি সেখানে গিয়ে দেখিলাম ছেলেটী মার কোলে শুয়ে বড়ই কাঁদছে। মা ব্যস্ত হ'য়ে কান্না থামাবার জন্য অনবরত মাই দিচ্ছেন, আর ছেলেটী অতি আগ্রহের সহিত মাই খেয়ে তখনই জমা দুধ বমি করিয়া ফেলিতেছে। খাবার দোষেই এরূপ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি মাই দিতে মানা করিলাম ও তাহার পিপাসা শান্তির জন্য একটু একটু মৌরীর জল দিতে বলিলাম। শিশুটী অল্পক্ষণেই সুস্থ হইল দেখিয়া তার বাপ মার আর কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। পিতা আমার কাছে এ খবর ব'লতে এলে আমি তাহাকে বুঝিয়ে দিলাম যে—ছেলেদের যত রোগ অধিকাংশই খাওয়ার দোষেই হয়। আগ্রহে দুধ খেলেই যে ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝিতে

হইবে, তাহা নয় —পিপাসাতেও ঐরূপ করে। তখন দুধ দিলে আরও অপকার হয়। কাঁদলেই যখন তখন স্তনপান করিতে দেওয়া ভাল নয়।

সে এই সকল উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শুনিল ও স্ত্রীকে গিয়া বুঝাইয়া দিল! পরে আপনি পকেট বহিতে সব লিখিয়া লইল। যে কথা গুলি দুই মিনিটে লেখা যায়, তাহা লিখিতে তার আধঘণ্টা সময় লাগিল।

একটি লোক একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিলেন, তার কতকগুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। অমন ফুল আবার কেহ কাহাকেও উপহার দেয়! জাহাজে বলিয়াই সাজিল। জাহাজে ত ফুল ফুটে না; আর হংকংও প্রকৃতিদত্ত ফুলের রাজ্য নয়। যাহা ফুটে, তাহা অতি কষ্টে। কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই এখানে ফুল ভাল বাসে। তাই ফুলের অসম্ভব দাম।

যে চীনেম্যানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন তাঁর কাছে অনেক গুলি চীনভাষায় লিখিত বই ছিল। যেমন হ'য়ে থাকে, তিনি যেমন ফুলভাল বাসেন তেমনি বই ও ভাল বাসেন। বই গুলিকে অতি যত্নকরে রেখেছেন। বই গুলির পাতার ভিতর ফুলের পাপড়ী দেওয়াছিল। আমিও অমনি রাখি। ওই খানেই ফুল রাখিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হয়।

ছোট পাতলা একপিট ছাপা কাগজে নির্ম্মিত এই চীনে বই গুলি দেখে আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল সে গুলি মাথায় রাখি, বুকে করি। নিজে বুঝিবার তো সাধ্য নাই! তবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে একখানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং (Quotation) উদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে পুস্তক ছিল। তাহার দু'একটীর ভাব নীচে উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালা সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাষায় কতকটা ঐরূপ ভাবের বচন জানা আছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাহাও লিখিলাম।

"বিনয় ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণ স্বরূপ।" চীন দেশীয় স্ত্রীলোককে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে পারিবে! এমন স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র রমণীজাতি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই।

আর একটী প্রবাদের এইরূপ অর্থ,—"অসময়ে অতিথি আসিলে সে শক্রর (তাতার) অপেক্ষাও কষ্টদায়ক হয়।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চীন দেশের লোক মোটেই অতিথি-পরায়ণ নহে; ভাই মরিলে ভাই কাঁদে না, অতি নিকট আত্মীয়ের দুরবস্থায় অর্থসাহায্য করে না। লোকে লোকারণ্য বলিয়া যে দেশে জীবিকা অর্জ্জন অতি কষ্টসাধ্য, সে দেশে অতিথি-সৎকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্।" প্রদীপ নিবিয়া গেলে আর তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে? একথার মর্ম্মান্তিক তাৎপর্য্য প্রাচীন চীনেরাও বুঝিয়াছিল।

আর একটী প্রবাদে মা ছেলেকে সদুপদেশ দিতেছেন। উহার ভাব, ঠিক নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটীর মত,—

"সুশীলোভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নগা যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমা যাতি সম্পদঃ॥"

বড়ই সারগর্ভ ও সদুপদেশ পূর্ণ নীতি কথা। পিতার কোলে উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ধ্রুবের ঠোঁট ফুলিতেছিল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সুচরিত্র হও, ধর্ম্মপরায়ণ হও, সকল লোকের—সকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা হইলে জল যেমন সর্ব্বদা নিম্নগামী হয়, সকল সুখ-সম্পাদও উপযুক্ত বোধে তোমাতেই আসিবে।"

ব্যথিত-হৃদয়ের উক্তি আর একটী শ্লোকের ভাব কতকটা নিম্নলিখিত শ্লোকের ন্যায়,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

কি আশ্চর্য্য! এই সকল নানা দেশের লোকের কার্য্য কলাপ দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থা বিশেষে আমরা যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। এখন দেখিলাম, লোকে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক একই স্বরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হয়।

তার মধ্যে আর একখানি পুস্তকে দেখিলাম, পুস্তক উৎসর্গ করিবার স্থানে যাহাকে উৎসর্গ করা হইতেছে তাহার নামোল্লেখ নাই,— কেবল লেখা আছে, "চির আরাধ্য—তোমাকে।" যেন গভীর অনুরাগের স্রোত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে—যে কারণেই হোক মুখ ফুটে বলিবার যো নাই।

আর একখানি পুস্তক কোন চীন মহিলা রচিত। চীন-জাপান যুদ্ধে তাঁহার প্রণয়ীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আক্ষেপ ক'রে লিখে ছিলেন। কোন ভাবুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছত্রের নীচে দাগ দিয়াছেন দেখিলাম। একটী ছত্রের অর্থ সরল ভাষায় এইরূপ,—

"হে প্রিয়জন! তোমার মধুর স্মৃতি এ জনমে ভুলিবার নয়।"

ঠিক যেন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের এই সরল উক্তিটীর মত,—

"তুমি যে দিয়েছ দেখা
পাষাণে তা আছে লেখা,
হৃদয় ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নয়।"

যখন সেই চীনেম্যানটীর নিকট এইসব পুস্তক সম্বন্ধে কথা কহিতে

ছিলাম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি সুমধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্ত্রীলোকেরা দূরে থেকে তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাঁশীর স্বর যেন কাঁদ-কাঁদ স্বরের মত। আর এত সুস্পষ্ট, ঠিক যেন কে কার নাম ধ'রে ডাক্‌চে। তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে আসছিল। আর সুদূর আকাশের এক প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত জ্বলছিল।

একটি ভদ্রবংশীয়া ক্যাণ্টনবাসিনী রমণী একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া একাকী যাইতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ ক্ষীণ ও মুখের ভাব অত্যন্ত মধুর। ছেলেটিকে নানা রংএর একখানি কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া তিনি ডেকের এক প্রান্তে থাকিতেন। ছেলেটির গায়ে একটু ময়লা বা মাটীর দাগ দেখিতে পারিতেন না। এদিকে তাঁহার এত সাজসজ্জা, কিন্তু মনে বিলাসের লেশমাত্র নাই। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস কিছুমাত্র ছিল না। সুসজ্জিতা অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকে এরূপ প্রায় দেখা যায় না। যখন তাহার দিকে দেখিতাম, চোখ সহজে ফিরিত না। একদিন চেয়ে দেখছি এমন সময় নির্ব্বাক চাহনীতে রমণী আমার স্থির দৃষ্টিকে তিরস্কার ক'রে যেন আমার ঘাড় হেট করে দিলেন। এইরূপে বিষম তিরস্কৃত হ'য়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে মনেই বলিলাম—"টিশি! তোমায় দেখি নাই। যাহার "অনিন্দ্য-সুন্দর-মধুর" ক্ষীণ গঠন তোমার গঠনেরই কতকটা সদৃশ ছিল, যাহার ছায়া আর এ নশ্বর সংসারে পড়িবে না, তাঁহারই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তোমার দিকে চেয়েছিলাম।"

এবার একটি বিপত্নীক চীনেম্যানের কথা বলিয়াই এ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাঁহাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তাঁহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে।

অন্য সকলের মত নয়; বেশভূষায়—তাঁহার অবহেলা, এবং দৃষ্টি শূন্যময়।

এক দিনেই তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহাস জানিলাম। তিনি একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার সওদাগর। দেহ ক্ষীণ। বয়স ৩০।৩৫ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সর্ব্বদা লোকের জনতা ছেড়ে একা একধারে ব'সে থাকতেন। কাহারও সহিত মিশা নাই—কাহারও সহিত কথা নাই; কেবল অসীম সমুদ্র ও অনন্ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে সময় কাটাতেন; কেবল একটি পরিচিত সমবয়স্ক চীনেম্যানের সহিত কথন কথন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে কথার ভাব, চোখের জল ছাড়া কান্নারই রূপান্তর।

আজ দুই বৎসর হলো তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আঠার দিনের একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চ'লে গেছেন। মাতৃহীনা মেয়েটিকে তিনি মার নামেই ডাকেন। প্রথম প্রসবের পরই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবু এখনও কেবলই বলেন—"যদি এ চিকিৎসা না ক'রে অন্য চিকিৎসা ক'রতাম হয়তো তিনি ভাল হতেন।"

জীবনে যেন বিষম বিপ্লব ঘ'টেছে ইহজন্মের মত চারিদিক শূন্য হ'য়ে গেছে। হাত থেকে রুমাল উড়ে গেলে কুড়াইয়া লইতেন না। বৃষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিয়া বসিতেন না। খাবার ঘণ্টা পড়িলেও খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ ব্যথা লেগেছে যে—সে কথা, সে প্রসঙ্গ, একবার তুললে হয়—অমনি সবাকার সামনেই ছেলে মানুষের মত আকুল হ'য়ে কাঁদেন।

ঘড়ির চেনে হাতীর দাঁতে আঁকা একখানি ছোট রমণী মূর্ত্তি তাঁর বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের মত। আর তুষার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোণ পুষ্পের মত সাদা।

হংকং।

[প্রথম প্রস্তাব।]

সাত দিনের দিন প্রাতে হংকং বন্দরে প্রবেশ করিলাম। বাহির দিক্ থেকে দেখিতে এমন সুন্দর দেশ আমি কখন কোথায়ও দেখি নাই। সমুদ্র ভেদ ক'রে পাহাড় উঠেছে; সহরটি সেই পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়টি ১৭০০ ফিটেরও বেশী উচু। সমুদ্র-জলের ধার হইতে স্তরে স্তরে অতিসুদৃশ্য বাড়ী গুলি যেন উপরে উপরে সাজান র'য়েছে। সে দৃশ্য বর্ণনায় বুঝান যায় না,—চ'খে না দেখ্‌লে অনুমান করা অসম্ভব।

ঠিক সমুদ্রের উপকূলেই প্রস্তর নির্ম্মিত চওড়া রাস্তা। তার উপরেই সারি সারি,—ঠিক একরকম দেখ্‌তে, চারিতলা বাড়ী। দূর হ'তে দেখতে ঠিক যেন ছোট পায়রার খোপের মত। মনে হয়, যেন সমুদ্র-জলের উপর হইতেই গাথিয়া তোলা। তার গায়ে নীল বর্ণের চীনে হরফে নানা কথা লেখা আছে। এ সকল স্থান পাহাড়েরই রাজত্ব, পাতরের দেশ; পথ, ঘাট, ঘর বাড়ী সবই পাতরে বাঁধান। বন্দরে গভীর জল। অথচ উপকূলে সিঙ্গাপুরের মত একটিও জেটি নাই। এত ঘন বসতির দেশে জাহাজ কিনারায় লাগিলে সমুদ্র-তীরে দোকান গুলিতে তিষ্ঠান দায়; আর অত গভীর জলে জেটীই বা তৈয়ার হবে কেমন ক'রে? সেই জন্য এখানে জাহাজ দূরে নঙর করে এবং বড় বড় চীনে বজরা ও জাঙ্কের সাহায্যে মোট-ঘাট নাবান উঠান হয়। শ্রমদক্ষ চীনে কুলির সাহায্যে তাহা গুরুতর কাজ ব'লেই মনে হয় না। অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি মাল বোঝাই হ'য়ে যায়।

যাত্রীদের নামিতে উঠিতেও নৌকার আবশ্যক। কিন্তু এ সকল

নৌকা সাম্পানের মত নয় এবং তাহাদের গঠনপ্রণালীও অন্যরূপ; সাম্পান অপেক্ষা আয়তনেও অনেক বড়। সাদা সাদা একরূপ হাল্‌কা কাঠ দিয়া অতি নিপুণতার সহিত গঠিত ও অতি সুকৌশলে পরিচালিত। ইহার 'ছত্রী' আছে এবং পিছনে একটী হা'ল ও বসিয়া বসিয়া অনেকগুলি দাঁড় টানিবার ব্যবস্থা আছে। পাল উঠাইবার এবং নামাইবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর; পালগুলি মাদুরের, ক্যাম্বিসের নয়। এত তাড়াতাড়ি ইহা চলা-ফেরা করে যে, পালের সাহায্য অনবরতই লইতে হয়। পাল সর্ব্বদা তোলাই আছে,—তা যে দিকেই হাওয়া হোক না কেন। হাল্‌কা নৌকাখানি পাল ও দাঁড়ের সাহায্যে তীরের মত ছুটে। বায়ুভরে এক একবার বিষম কাৎ হয়; কিন্তু নৌকা এত হাল্‌কা যে, ডুবিবার কোন ভয় নাই। আর সেই সময় নৌকায় সমুদ্রের ঢেউ লাগিয়া অতি মধুর কল্‌-কল্‌ শব্দ হয়।

জাহাজ থামিবামাত্র অতিশয় ব্যস্ততার সহিত শত শত নৌকা, যাত্রী নামাবার জন্য জাহাজের চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। চাহিয়া দেখি, প্রায় সকল নৌকাই চীনে স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত। হা'ল ধরিয়াছে স্ত্রীলোক, দাঁড় টানিতেছে স্ত্রীলোক। এমন দৃশ্য পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, কখন শুনিও নাই। স্বাধীনভাবে, সানন্দচিত্তে নৌকায় দিবারাত্র বাস হেতু স্বাস্থ্যের যে একটা প্রফুল্লতা জন্মে, তা তাদের প্রত্যেক অঙ্গে,—প্রত্যেক হাব-ভাবে জানা যায়। নীল পোষাকের উপর সাদা রঙের পূর্ণ বিকাশ—ঠিক যেন ছবির মত দেখায়। প্রাতঃকালীন সূর্য্য-রশ্মি সেই সকল মুখের উপর পড়িয়া স্বচ্ছ সরোবরে শ্রেণীবদ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। আমি যত দিন হংকং বন্দরে ছিলাম, প্রতিদিনই প্রত্যুষে ক্যাবিনের ছোট গোঁজলা দিয়ে ঐরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখে আমার সুপ্রভাত হ'ত।

নৌকায় তারা সপরিবারে বাস করে। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা

সকলে একত্র থাকিয়া, একত্র কাজ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই নৌকাতেই তাদের জন্ম, তাদের বিবাহ, বংশ বৃদ্ধি ও মৃত্যু। কত পুরুষ ধরিয়া এরূপ চলিতেছে। জমির উপর তাদের থাকবার ঠাঁই নাই,—দেশে এত লোকারণ্য, এত স্থানাভাব। চীন দেশে এরূপ নৌকার ঘর-বাড়ী অনেক আছে। এক হংকং সহরেই চারি লক্ষ লোকের মধ্যে বিশ হাজার লোক এইরূপ জলে বাস করে। ক্যাণ্টনে আরও অধিক। শ্যাম রাজ্যের রাজধানী বেংকক্ সহরেও এরূপ অনেক আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষে কাশ্মীর দেশেও এরূপ অনেক দেখা যায়।

এক একটী নৌকা ছেলে-পিলেয় ভর্ত্তি। তারাও মা-বাপকে সাহায্য করে। কোন স্ত্রীলোক হয়ত পিছনে হা'ল ধরিয়াছে,—তার পিঠে একটী কচি ছেলে বাঁধা। অন্যান্য ছোট বড় ছেলেমেয়েগুলি লগী ফেলে, দাঁড় বেয়ে তার সাহায্য করিতেছে। কাজে সাহায্য হবে ব'লে সকল চীনে মাঝিই বিয়ে করে। এত শীঘ্র শীঘ্র তাদের ছেলে পিলে হয় যে, মনে হয়, এক বছর, দেড় বছর মাত্র ছেলেমেয়েগুলি সব পিঠেপিঠি হ'য়েছে। একখানি ছোট বোটে চৌত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটি চীনেম্যানের নয়টী সন্তান দেখিলাম। আমাকেও হারিয়েছে! অনবরত সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে সকলেরই শরীর বেশ সুস্থ।

পাছে জলে ডুবে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক ছেলের গলায় একটা ঝুড়ির মত হাল্‌কা জিনিষ বাঁধা থাকে। জলে প'ড়ে গেলেও মাথা ভাসতে থাকবে ব'লে এরূপ করা হয়। সেইটুকু নৌকার ভিতর অনেকের রন্ধনাদি করিবারও ব্যবস্থা আছে। একটী ছোট খাঁচাতে মুর্গী বা হাঁস পোষা আছে,—তারা ডিম দেয়। অনেকে আবার ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে ভাত তরকারী ইত্যাদি কিনে খায়, নিজেরা রাঁধে না।

চীন ফিরিওয়ালার দেশ। লোকেরা নিজ নিজ কাজ নিয়েই ব্যস্ত,—আহারাদি বা অন্য আবশ্যকীয় কাজের বিষয় তাহাদিগকে কিছুই ভাবতে হয় না। ফিরিওয়ালারাই সব যোগায়; ভাতও ফিরি ক'রে বিক্রি হয়। চীনে স্ত্রীলোক জামা-কাপড় রীপু ক'রে বেড়ায় ও অন্য ফিরিওয়ালা আফিম, চা ও চুরুট বেচে যায়।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী, খোনা স্বরে কহিয়া ইহারা নেহাৎ আবশ্যকীয় মনের ভাবগুলি প্রকাশ করে। পৃথিবীর পূর্ব্ব-অঞ্চলের বাণিজ্যস্থান মাত্রেরই সাধারণ ভাষা ইংরাজী। শুনেছি নাকি ভূমধ্য সাগরের আশে পাশে সকল স্থানেই ফরাসী ভাষাই চলতি। দক্ষিণ আমেরিকায় সেইরূপ স্পেনিস্ ভাষাই প্রচলিত। এরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা খোনা ইংরাজীর নাম "পিজন ইংলিস্"। তার না আছে ব্যাকরণের ঠিক, না আছে উচ্চারণের ঠিক,—কোনরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। ভাষা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মরিস্ সাহেব তাঁহার "ভাষা-বিজ্ঞান" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এই পিজন ইংলিসই জগতের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে। একথাও অসম্ভব বোধ হয় না। এ অঞ্চলের যেখানে গেলাম, তথাকার অধিবাসীরা,—অজ্ঞই হোক আর বিজ্ঞই হোক, অল্প-বিস্তর পিজন ইংলিস জানে; রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাই পৃথিবীর ভাষা হইবে। ফরাসী ভাষার এতদিন যেরূপ প্রাধান্য ছিল, কালক্রমে ইংরাজীই তাহা অধিকার করিবে।

পূর্ব্বোক্ত নৌকার লোকেরাও এইরূপ ইংরাজী ভাষায় দর-দস্তুর করে। পিজন ইংলিসের দু'একটা উদাহরণ দিলে পাঠক বেশ বুঝতে পারবেন। একদিন নৌকা-ভাড়া দেবার জন্য আমার কাছে কিছু ভাঙ্গান ছিল না। সুতরাং নৌ-সিমন্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ডলারের চেঞ্জ (ভাঙ্গানি) আছে ?" স্ত্রীলোকটী বলিল,—"Dollar me not got" অর্থাৎ,—"ডলারের ভাঙ্গানি আমার নাই।" আর এক দিন হংকং সহর দেখে ফির্‌তে অনেক রাত্রি হ'য়েছিল। "সাম্‌পান" "সাম্‌পান" ক'রে হাঁক দিলাম,—একজন স্ত্রীলোক নৌকা নিয়ে এল। অত অন্ধকার রাতে অতগুলি জাহাজের মধ্যে ঠিক আমার জাহাজখানি খুঁজে নেওয়া বড় সোজা কথা নয়। স্ত্রীলোকটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সিপ্‌" ? অর্থাৎ—যে জাহাজে আমি যাইতে চাই তার নাম কি ? আমি বলিলাম,—"পালামকোটা।"

স্ত্রীলোক। পালামকোটা,—ইংলিস সিপ্‌ ? অর্থাৎ,—ইংরাজের জাহাজ কি ?

আমি। হাঁ—ইংলিস সিপ্‌।

স্ত্রীলোক। Two masts অর্থাৎ,—তার কি দুইটী মাস্তল আছে ?

আমি। হাঁ, Two masts

স্ত্রীলোক। From Singapore ? অর্থাৎ—সিঙ্গাপুর থেকে আস্‌ছে কি ?

আমি। হাঁ, From Singapore.

স্ত্রীলোক। To Amoy tomorrow ? অর্থাৎ,—কাল কি এময় যাবে ?

আমি। হাঁ, কাল এময় যাবে।

এই সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সেই চতুরা মেয়ে মাঝি এত জাহাজের মাঝে আমাকে ঠিক জাহাজে পৌঁছিয়ে দিল।

নৌকায় বসিয়া ইতস্ততঃ দেখতে দেখতে দেখলাম যে সে একাই হাল ধ'রেছে, পালও তুলেছে। তাকে আর কেউ সাহায্য ক'রবার নাই। ছোট ছোট ছেলে গুলি ছত্রীর ভিতর ঘেঁষাঘেঁষি করে এ ওর গায়ে পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুই তিন মাসের একটি

ছোট মেয়ে একধারে শুয়ে রয়েছে। মায়ের জন্য তার পাশেই একটু অতি অপ্রশস্ত শুইবার ঠাঁই।

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তোমার স্বামী কোথা?" স্ত্রীলোকটী বলিল,—"তিন মাস হ'ল মারা গিয়েছেন; তখন এই মেয়েটি আমার পেটে।" বল্‌তে বল্‌তে তার যেন সব অতীত কথা স্পষ্ট মনে জেগে উঠ্‌ল; গলার স্বর বাষ্প-গদগদ হ'ল। অন্ধকারে যেন এক ফোঁটা পবিত্র চক্ষুজল চোখে মুক্তার মত দেখা দিল। কি ক'রবে। উপর হইতে কেড়ে নিয়েছেন, উপায় ত নাই; তাঁরই ছোট ছোট প্রতিমূর্ত্তি-গুলিকে দেখে সে কোনরূপে দিন গুজরান করে। যার শরীরে স্বাস্থ্য আছে, উচ্চ আশা ত্যাগ করিতে পারিলে তার আবার ভাবনা কিসের? জাহাজে পৌছিলে পর ৩০ সেণ্টের পরিবর্ত্তে আমি তাকে কিছু বেশী দিলাম। নির্ব্বাক কৃতজ্ঞতা যে কাকে বলে সেই দিন আমি প্রথম দেখলাম।

চীন দেশে মেয়ে-পুরুষে দিন নাই রাত নাই সর্ব্বক্ষণই খাটে। কখনও কখনও বা শিশুটিকে পিঠ থেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে মাই দেয় ও ভয়ে ভয়ে এবং সলজ্জ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কেউ তার দিকে চেয়ে দেখছে কি না। চীনেম্যানরা তাকায় না, অন্য দেশের লোকেরা তাকায়।

চীনে বোটওয়ালীর কথা বল্‌তে গিয়ে এতখানি হইল, তার কারণ, আমি চীনেম্যান সম্বন্ধে যা কিছু দেখেছি, তা আমার বড় বিস্ময়কর ব'লে মনে হ'য়েছে। কলিকাতা হ'তে এত পথ গিয়াছিলাম কেবল দেশে চীনেম্যান দেখব ব'লে। ব্রহ্ম ও মালয় দেশ আমার তত ভাল লাগে নাই। তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিও না লিখিও নাই। কিন্তু চীনদেশ ও চীনেম্যানের কার্য্যকলাপ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি।

এই সকল চীনে বড় বজরা ও কিস্তী নৌকা (জাঙ্ক) ও সাম্পান ছাড়া বন্দরে বিস্তর অর্ণবপোতও দেখ্‌লাম। নানা দেশের ছোট বড় নানা আকারের অর্ণবপোত নানা রকমের নিশান উড়িয়ে গতায়াত করিতেছে। তার মধ্যে অনেক গুলিতেই "ড্রাগন" আঁকা নিশান উড়িতেছে। ইংলণ্ডের যেমন "ইউনিয়ন জ্যাক," চীন রাজ্যের তেমনি "ড্রাগন" --গিরগিটির মত এক রকম জানোয়ার অঙ্কিত নিশান। লাল কালো হল্‌দে রঙে ড্রাগন আঁকা,—দেখলে মনে হয় যেন যথার্থই হাঁ ক'রে কামড়াতে আস্‌ছে! চীনরাজা নিকটে ব'লে সকল জাতিই এখানে চীনে নিশান উড়ায়। এই সকল জাহাজের মধ্যে অনেকগুলিই রণতরী,—মানোয়ারী জাহাজ ও ক্রুজার জাতীয় জাহাজ দিনের মধ্যে দশ পোনের খানি যাতায়াত করে। তাহাদের সম্ভাষণার্থ হংকংএর নিকটস্থ কাউলন কেল্লা হইতে অহরহ তোপধ্বনি শুনা যায়। চীন সমুদ্রে গিয়া অবধি আমার সর্ব্বদাই রুষ-জাপান যুদ্ধের কথা মনে হ'ত। সকল সভ্য দেশেরই রণতরী, পাছে কোন গোলমাল উঠে এই আশঙ্কায়, সদাই যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত আছে। জাহাজের সকল লোকের মুখেই রুষ-জাপান যুদ্ধের কথা।

রণতরী।

সকল জাতিরই জাপানের দিকে টান। এমন কি একটী বৃদ্ধ ফরাসী সওদাগরেরও দেখলাম জাপানের প্রতি সহানুভূতি। তিনি অতি সরলভাবে ব'লতেন,—"যেমন একটী বড় লোকের সঙ্গে একটি ছোট ছেলের কুস্তী হ'লে সকলেরই ছেলেটীর দিকে টান হয়, তেমনি সকল লোকেরই জাপানের জন্য সহানুভূতি স্বাভাবিক। তবে জাপান যখন বড় বড় যুদ্ধে জিতবে, তখন আবার অনেক ইউরোপীয়ানের চোখ টাটাবে। এসিয়াবাসীর কাছে ইউরোপের পরাস্ত হওয়া বড় অপমানের কথা। বিজিত অন্যান্য এসিয়াবাসীর তাতে চোখ ফুটবে। ইংলণ্ডের জাপানপক্ষ সমর্থন কেবল মৌখিক মাত্র। স্বার্থ আছে ব'লেই ইংলণ্ড এরূপ করিতেছে। জাপানের দুর্দ্দিনে ইংলণ্ড কখনও সাহায্যার্থ অগ্রসর হবে না। জাপান হারিলে জাপানের অস্তিত্বই লোপ পাইবে। আর এখন জাপান যতই জিতুক, শেষে তাকে হারিতেই হ'বে—যদি রুষিয়ায় ঘরোয়া গোলমাল না বাধে।" *

প্রতি বন্দরেই জাহাজের জন্য সংবাদপত্র লওয়া হইত, তাহা হইতে যুদ্ধের অনেক খবর পাইতাম। এইতো ভীষণ চীন সমুদ্র, জাপানের দিকে আরও ভীষণতর। টর্পেডোর আঘাতে ও গোলার চোটে যখন জাহাজগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, তখন কত শত লোক এক নিমেষের মধ্যে বিনষ্ট হয়। ডুবে মরা, পুড়ে মরা, বম্ব-সেলের আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে মরা, কি ভীষণ-যন্ত্রণাদায়ক! ঐরূপ ব্যাপারই সেখানে দিবানিশি ঘটিতেছে; আত্মীয়-

---

* এই প্রবন্ধ লেখার পর রুষ-জাপান-যুদ্ধ থামিয়াছে। মার্কিণ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আন্তরিক চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে। এই যুদ্ধে জাপান পৃথিবীতে কিরূপ গৌরব, কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রুষিয়ার ঘরোয়া-বিবাদ এখনও মিটে নাই। এ গ্রন্থে সে সব কাহিনী বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।—লেখক।

স্বজনের কুশল-কামনায় ব্যর্থ ক'রে অসংখ্য মানব, পতঙ্গের মত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।

এদিকে যেমন হংকং দ্বীপ, অপরদিকে অনতিদূরে চীন-সম্রাটের শাসনাধীন চীন দেশ অবস্থিত। দুটী এত নিকট নিকট যে, গোলা-গুলি মারিলে তাহা হংকং দ্বীপ হইতে তথায় পৌছায়। অনেক নৌকা ষ্টীমার ও জাহাজ অনবরত হংকং হইতে তথায় যাতায়াত করিতেছে। তার মধ্যে একটী স্থান ক্যাণ্টন।

চীনরাজ্যের দক্ষিণ অংশে যত নগর আছে, তার মধ্যে ক্যাণ্টন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর, স্বনাম-প্রসিদ্ধ একটী নদীর তীরে অবস্থিত। হংকং হইতে আমেরিকান কোম্পানীর জাহাজ দিনে দু'খানি সেখানে যায় আসে এবং বারো ঘণ্টায় হংকং হইতে ক্যাণ্টনে গিয়া পৌছায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল অঞ্চলে আমেরিকানদের কাজ কারবারই বেশী। সেইরূপ নিকটবর্ত্তী আরও অনেক স্থানে তাদেরই জাহাজ যাতায়াত করে। ক্যাণ্টন যাইবার জাহাজ গুলির নীচের তলায় কেবল 'ট্যাঙ্ক' অর্থাৎ বড় বড় চৌবাচ্চায় পরিপূর্ণ। সেইখানকার জলে নানা রকমের মাছ জীয়াইয়া আনা হয়। জাহাজের অন্যান্য তালা চীনে যাত্রীতে পরিপূর্ণ। জাহাজে অবস্থিতিকালে চীনে যাত্রীদিগকে একটী প্রশস্ত কামরায় তালা চাবি দিয়া রাখা হয়। এরূপ করার কারণ, পূর্ব্বে চীনদেশে বোম্বেটে দস্যুর সংখ্যা অতিশয় বেশী ছিল। তাহারা যাত্রী সাজিয়া জাহাজে উঠিত এবং জাহাজের সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। তাই সকল যাত্রী-দিগকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

ক্যাণ্টনের মত বহু লোক-পূর্ণ সহর আর কোথাও নাই। সহরটি আয়তনে খুব বড় নহে, অথচ তথায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। কলিকাতায় দশ লক্ষ লোকের বাস। নদীর উপর বোটে বাস করে,

এমন লোকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। নদীমধ্যস্থ একটী দ্বীপে বিদেশীদের আড্ডা। সেখানে যাইবার সাঁকোর পথে সর্ব্বদা প্রহরিগণ পাহারা দিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশে দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। কারণ দেখিতে যতই ভাল মানুষ হউক, নিজদেশে বিদেশীকে অসহায় পাইলে চীনেম্যানরা তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। এখানে আফিম্ বিক্রয়ের কোনও মানা নাই বলিয়া, আফিমসেবী চীনেম্যানেরা কাপড় তোরঙ প্রভৃতির ভিতর করিয়া এখান হইতে লুকাইয়া হংকংএ আফিম্ লইয়া যায়। সেই কারণে হংকংএ জাহাজ পৌঁছিলেই শিখ পুলিস আসিয়া চীনে যাত্রীদের কাপড় ও বাক্সের ভিতর আফিম্ আছে কিনা তাহার তদন্ত করে।

জাহাজ নঙর করিয়া সিঁড়ি ফেলিবামাত্র অসংখ্য ফিরিওয়ালারা আসিয়া জাহাজে উঠিল। তারমধ্যে অনেকেই খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারী। বড় বড় বাঁকে করিয়া রাঁধা ভাত মাছ তরকারী প্রভৃতি আনিয়া, তাহারা দোকান খুলিয়া বসিল। জাহাজে বসিয়াই চীনে যাত্রী তাহাদের নিকট হইতে রাঁধা ভাত তরকারী কিনিয়া খাইতে লাগিল। চীনেম্যানের আহারের কথা বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক; অন্য প্রবন্ধে তাহা বলিব।

হংকং।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

জহাজ নঙর করিলেই যে তখনি নামা যায়, তাহা নহে। ডেকের চারিদিক কাঁধের সমান উচু মোটা কাঠের পাঁচিরে ঘেরা। এইটি খুলিতে হয়। ডেক হইতে জল প্রায় ১০ কি ১২ হাত নীচে। সেখানে নামিবার জন্য সিঁড়ি ফেলিতে হয়। এ সব ঠিক হইলেও প্রথম অবস্থায় যাত্রীয় এত ভিড় হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করা দুঃসাধ্য। ইত্যবসরে অসংখ্য ফিরিওয়ালা নানাপ্রকার বিক্রয়ের দ্রব্য লইয়া জাহাজে বেচিতে আসে। আহারের দ্রব্যই তার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

বড় বড় বাঁকে করিয়া ভাত, তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি নানা রকম রাঁধা দ্রব্যাদি আনিয়া ফিরিওয়ালারা জাহাজের আশে পাশে দোকান খুলিয়া বসে। জিনিষগুলি এমন সুকৌশলে সাজান যে, রাশি রাশি দ্রব্যাদি থাকিলেও একটী পড়ে না বা ভাঙ্গে না,—বাহির করিয়া লইতে বা রাখিতে কোন অসুবিধা হয় না। ফিরিওয়ালাদের ভারেই উনান আছে। গরম থাকিবে বলিয়া সেই সব উনানে দ্রব্যগুলি বসান থাকে। সব খাবারই গরম পাওয়া যায়।

নিজে অগ্নিমান্দ্যে ভুগি ব'লে পরে কি খায়, কেমন ক'রে খায় ও কিরূপ হজম করে এ সংবাদ লইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই অনিমেষ-নয়নে চীনেম্যানদের খাওয়া দেখিতাম।

তাহারা কখনও আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেয় না; শত কাজ থাকিলেও যথাসময়ে খাইবেই খাইবে। গরম জিনিষ ভিন্ন কখনও ঠাণ্ডা জিনিষ তাহারা খায় না। কখনও হাত দিয়ে খায় না। "চপ ষ্টীক্"

ন্যমক এক প্রকার কাঠি আছে, তাহাই ডান হাতের অঙ্গুলির দুই ফাঁকে দুইটী ধরিয়া তদ্দারাই আহারীয় দ্রব্যাদি অতি দক্ষতার সহিত উঠাইয়া খায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের প্রধান আহার ভাত ও মাছ। মাঝখানে একটী বড় পাত্রে করিয়া ভাত রাখা হয়। পাত্রের চতুঃপার্শে কাঠের থালার উপর কাচ-কড়ার বাটীতে তরকারী সাজান থাকে। সকলে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসে। প্রত্যেকে এক একটী ছোট পেয়ালা করিয়া ভাত লইয়া বাম হাতে করিয়া মুখের কাছে ধরে ও ডান হাতের কাটী দিয়া অল্প অল্প ভাত মুখের
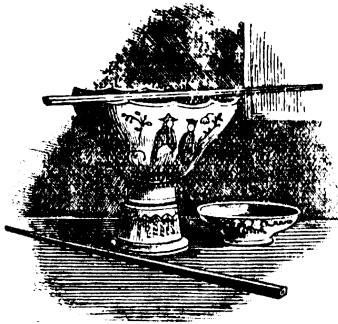
চীনের ভোজনপাত্র।

মধ্যে উঠাইয়া দেয়; আর মধ্যে মধ্যে এইরূপে তরকারীর বাটী হইতেও তরকারী উঠাইয়া লইয়া মুখে দেয়। ছিবড়ে বা মাছের কাঁটা ঐ কাঠি দিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া সম্মুখে এক জায়গায় জমা করে। এত দক্ষতার সহিত তাহারা কাঠি দুটী চালনা করে যে, একটী ভাত বা একটু তরকারী স্থানান্তরে পড়ে না। অনেকেই এক বাটি হইতে তরকারী লইয়া থাকে। বিক্রেতাও মধ্যে মধ্যে আপনার দ্রব্য হইতে উঠাইয়া লইয়া খায়। এক সঙ্গে খায় ও বেচে। "সকড়ী" বলিয়া কোনও বিচার নাই। খেয়ে

আঁচায় না ও মলত্যাগের পর জলশৌচ করে না, কাগজ ব্যবহার করে। জল ব্যবহারে বড়ই নারাজ। এক পেয়ালা রাঁধা ভাত ও চার রকম তরকারীর মূল্য ২ সেণ্ট, অর্থাৎ দু'পয়সা মাত্র। এইরূপ দুই পেয়ালামাত্র ভাত পাইলেই তাহার এক বেলার খোরাক হয়। তারা তিন বেলা খায়,—সকাল ৮টা দুপুর ১টা ও সন্ধ্যা ৬টা। খাবার পরিমাণ ধরিলে, আমরা দুইবারে যত খাই তদপেক্ষা তাহারা অনেক কম খায়।

চীনেম্যানদের হজমশক্তি এত সতেজ থাকে তার অনেক কারণ আছে। কাঠি দিয়া অল্প অল্প ভাত উঠাইয়া খায় বলিয়া আস্তে আস্তে বেশ চিবাইয়া খাওয়া হয়। খেতে বসে তারা কখনও জল খায় না। ঠাণ্ডা সরবৎ প্রভৃতি জিনিষ কখনও খায় না। মাঝে মাঝে ছোট পেয়ালায় ক'রে দুধ চিনি বিহীন সবুজে চা সিদ্ধ খায়; একত্রে বসিয়া খাইতে খাইতে নানা গল্প করে। পরিমাণে অল্প খায়। আস্তে আস্তে অনেক ক্ষণ ধরিয়া খায়। যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করে। ধনী হইলেও বসিয়া শুইয়া সময় কাটায় না। অন্য কিছু করিবার না থাকিলে জুয়া খেলে। লেখা পড়ার সহিত বড় একটী সম্বন্ধ নাই। সদা সন্তুষ্ট চিত্তে মনের আনন্দ লইয়াই আছে। সকল শ্রান্তি, সকল ব্যথা আফিম সেবনে জুড়ায়। এই সকল নানা কারণে যা খায় তাই সুহজম হয়, দেহও খুব সুস্থ ও সবল থাকে। আজ কাল যে আমাদের দেশে দেশশুদ্ধ লোক ডিস্‌পেপ-সিয়ায় (অগ্নিমান্দ্য রোগে) ভুগ্‌চে, তার একটি প্রধান কারণ তাড়া-তাড়ি খাওয়া। পাঁচ পাঁচটি আঙ্গুলের সাহায্যে, আফিস স্কুল যাইবার ব্যস্ততায়, ভালরূপে না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি আহার সেরে ফেলা অনুচিত। আমাদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া একটী অবহেলার কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনেম্যানদের কিন্তু খাওয়াটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কাজ।

তবে তারা খায় যা তা। সে সব খাদ্যের কথা ভাবিলেও বমি

আসে। অতি জঘন্য দ্রব্যাদি,—যাহা সকল দেশের সকল লোকের হেয়, চীনেম্যানরা তাহা আদরের সহিত খায়। যদিও তেলাপোকা খাওয়া দেখি নাই, কৃমিজাতীয় একরূপ পোকা খাওয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া তার জন্য আলাহিদা বেশী দাম দিতে হয়। ছোট ইন্দুর, বড় ইন্দুর ভাজা দোকানে দোকানে টাঙ্গান থাকে। পাখীর মধ্যে হাঁস ইহাদের বড় প্রিয় খাদ্য। সুধু পালক ও নাড়ি-ভুঁড়ি বাদে পায়ের নখ হইতে মুখের ঠোঁট অবধি রাখিয়া আস্ত ভাজা হয়। চতুষ্পদের মধ্যে পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি উপাদেয় মাংস থাকিতে ইহারা শূকরমাংসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করে। তারমধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু অংশ নাসিকার অগ্রভাগটুকু। জীব জন্তুর নাড়ী ভুঁড়ির ভিতর হইতে বিষ্ঠাদি সাফ করিয়া তার ভিতর থোড়া মাংস পুরিয়া ভাজা অতি উপাদেয় খাদ্য। আর চর্ব্বি ও রক্ত দিয়া এক প্রকার ঝোল প্রস্তুত হয়। তাতেই ডুবিয়ে এই সকল মাংস খাইতে তারা আরও ভালবাসে। আমার নিজের যদিও খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বড় ঘৃণা নাই, তবু আমারও এ সব কথা মনে হলে স্থির-সমুদ্রে সামুদ্র-পীড়া হবার উপক্রম হতো। কিন্তু এরা যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খায়, তা দেখলে এত জঘন্য জিনিষ খাওয়ার যে বিকটত্ব তাহা কতক পরিমাণে ক'মে যায়।

ষ্টীমারের উপরেই ফিরিওয়ালাদের নিকট বসিয়া চীনেম্যানরা কিরূপে খাইতে লাগিল, এখানে সেই বর্ণনাই করিলাম। নিজ নিজ বাড়ীতে ও হোটেল প্রভৃতি স্থানে যেরূপে আহার করে, তাহাও অনেকটা ঐরূপ। সচরাচর তারা চেয়ারে বা টুলে বসিয়া কাজ করে ও টেবিলে খায়। অনন্যোপায় না হইলে কখনও মাটীতে উবু হইয়া বসিয়া আহার করে না এবং কাজও করে না। জাপানীরা কিন্তু আমাদের মত মাটীতে বসিয়া আহার করিতে ভালবাসে এবং

মাটীতে বসিয়া কর্ম্ম করারও পক্ষপাতী। তবে আমাদের মত বসে না,—হাঁটু পাতিয়া কশাইর মত বসে।

এই খানেই চীনে হোটেলের কথা বলিয়া রাখি। হংকং সহরে চীনেদের একটী হোটেলে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক নূতন জিনিষ এবং নূতন প্রথা দেখিলাম। চীনে হোটেল গলি-ঘুজিতে। আমি যে হোটেলের কথা বল্‌চি, এ হোটেলটী খুব বড়; সহরের মধ্যে জনতাপূর্ণ একটী স্থানে অবস্থিত এবং যারপর নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হোটেল লোকে লোকারণ্য। অনবরত লোক ঢুকিতেছে ও বাহির হইতেছে। দরজায় চীনেম্যান কেরাণীরা লোকের হিসাব রাখিতেছে। ইউরোপীয় বা অন্য জাতীয় কর্ম্মচারী কেহই নাই। হোটেলটি দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগে সাহেবী রকমের খানা হয়, অপর দিকে চীনে রকমের; শেষোক্ত ধারেই ভিড় বেশী।

হংকং সহরের একজন চীনে গৃহস্থের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই আমাকে খাওয়াইবার জন্য হোটেলে আনে। আমার দেখামাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেদিকে চীনেম্যানের খাওয়া হয়, সেই দিকটিই আমার ভাল লাগিল। তৎপরে হোটেলের অপর দিকেও গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজান ঘরগুলি বিশ্রী অশ্লীল ছবিতে পরিপূর্ণ। চীনেম্যানরা ব্রাণ্ডী, হুইস্কী প্রভৃতি তেজস্কর মদ পান করে না। আফিমসেবিদের ওসব বড় সহ্য হয় না; কারণ আফিমে আলস্য আসে ও মদে উত্তেজনা বাড়ায়। তাই তারা নেহাত ক্ষীণবল বিয়ার রম প্রভৃতি মদ্য ভালবাসে। তাও আবার অর্দ্ধেক লিমনেড মিশিয়ে পান করে। এরূপ মদ খাওয়া দেখে আমি আর হেসে বাঁচি না। আর ইহাদের 'চাট' কুমড়ার বিচি ভাজা, শসাসিদ্ধ ও সর্ব্বতীনেবু। আহারের সময় খাদ্যদ্রব্যের ছিব্‌ড়ে কাঁটা ইত্যাদি সেই ধোপ দেওয়া টেবিলঢাকা কাপড়ের উপরেই ফেলিতে হয়; আহারান্তে সবশুদ্ধ চাদরখানি উঠিয়ে

নিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হইলে পরিষ্কার কাচকড়ার পাত্রে অডিকলম সুগন্ধি গরম জল ও সাবাঙ এবং এক একখানি বিধবে ভিজান ভাঁজকরা তোয়ালে এক একটি লোকের জন্য প্রস্তত থাকে। হাত মুখ ধুইয়া মুছিয়া চুরট খাইতে খাইতে বাহির হইতে হয়। এত উপাদেয় দ্রব্যাদি উপভোগ করার মূল্য এক ডলার মাত্র।

জাহাজ হইতে নামিবার আগেকার আর একটী ঘটনা পাঠক মহাশয়দের জানা উচিত। জাহাজ নঙর করার পর সিঁড়ি ফেলা হইলেই জন কতক চীনে ধোপানী কাপড় নিতে এলো। তাদের মধ্যে এক জন এলোচুলে প্রথম শ্রেণীর সেলুনে ঢুক্‌লো। সে তথায় আসিবামাত্রই সব চাকর-বাকর তার কাছে পতঙ্গের মত এসে উপস্থিত হ'লো। সেও চির-পরিচিতের মত অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কাহাকে বা মিষ্ট হাসি কাহাকেও বা মিষ্ট কথা উপহার দিয়ে আমার ছোকরা চাকরের পিট চাপড়ে ব'ল্লে,—"আ গেল যা দুষ্টু ছেলে,—তুমি আমাকে এতক্ষণ বল নাই যে ডাক্তার সাহেব কাপড় কাচাতে চান!" ছোক্‌রা এরূপ ব্যবহারে বড়ই খুসী হ'য়ে বল্লে, "আমি এখুনি তাই ব'লতে যাচ্ছিলুম ভাই। কিন্তু ৪।৫ দিনের ভেতর দেওয়া চাই।"

তারপর দিন আমাকে বলিল,— "ধোপানী আপনার কাপড় কালই আনবো ব'ল্লে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? আমি তো এত শীঘ্র তোমাকে তার বাড়ি তাগাদার জন্য যেতে বলি নাই? কেন তবে সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ি গিয়েছিলে বাপু?" সে ঘাড় নীচু ক'রে রইল, এ কথায় আর উত্তর দিতে পারিল না। কাপড় কাচিয়া আসার পর সে আমাকে বলিল,—"প্রতি কাপড় খানির জন্য ধোপানীকে ১৫ সেণ্ট দিতে হবে।" অন্যে ১০ সেণ্ট দেয় জেনেও আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে তাই দিলাম। দশখানি কাপড় কাচার মূল্য ১৷৷০ ডলার অর্থাৎ দুই টাকা এক আনা লাগিল।

যাত্রীর ভিড় একটু কমিয়া গেলে জাহাজ হইতে নামিলাম। ছে
নৌকার সাহায্যে তীরে আসিলাম, সে নৌকায় সপরিবারে একটি চীনে গৃহস্থ বাস করে। পা'ল তোলাতে যাই নৌকাখানি বায়ুভরে হেলিল, অমনি আমাদের ভয় হইতেছে বুঝিয়া নৌ-সীমন্তিনী বলিয়া উঠিলেন—"No fear! No fear!" অর্থাৎ—"ভয় নাই, ভয় নাই।"

তীরে নেমে দেখি ক্যাণ্টন হইতে একখানি জাহাজ তখনই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তার যাত্রীদের নিকট আফিম আছে কিনা তদন্ত করিতে করিতে অনেকজন শিখ পাহারাওয়ালা চীনেদের উপর নানারূপ তম্বি-তাগাদা করিতেছে। আমরা হিন্দিতে পথ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা দুইখানি রিক্স ডাকিয়া দিল। রিক্সওয়ালারা আমাদের দুই জনকে—প্রত্যেকের ৫ সেণ্ট ভাড়ায় পোষ্টাফিসে পৌঁছিয়া দিল। হংকংএ নামিয়াই প্রথম দৃশ্য দেখিলাম,—কোন চীনে মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টির জন্য তাঁহার মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

ধনী লোক মারা গিয়েছেন, তাঁর শবদেহ বাক্সে বন্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তার পিছনে পিছনে রিক্সর সারি চলিয়াছে। অনেক গুলিতেই উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা চীনে স্ত্রীলোক মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সকরুণ আর্তনাদ শুনিয়া মনটা কেমন হ'য়ে গেল। তাঁরা মৃত আত্মীয়ের স্নেহের কথা ও তাঁহার সহিত চির-বিচ্ছেদের কথা ভাবতে ভাবতে অধীরা হ'চ্চেন। আমারও নিজের বাড়ির কথা মনে হ'তে লাগল। জাহাজের উপর অনেক দিন বাদে চিঠি পত্র পাওয়া যায়। কে কেমন আছে ভাবিয়া মনটা যেন বাড়ী আসবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

ডাকঘরে গিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখিব ব'লে টিকিট কিনিবার জন্য একটি ডলার দিলাম। চীনে পোষ্টমাষ্টার বলিল, "এ ডলার এখানে চলবে না।" টাকা সিঙ্গাপুরে চলে না। আবার সিঙ্গাপুরের ডলার এখানে

চলে না। আবার এখানকার ডলার এময়ে চলে না। সব আলাহিদা ছাপ মারা, তাই অচল। চীন মুলুকের এইটী এক অদ্ভুত ব্যাপার, পঞ্চাশ ষাট ক্রোশ গেলে পরেই যেন সব বদ্‌লে যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকম চীনে ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা, ডাকটিকিট, ও আইন। অথচ মানুষ গুলিকে দেখিতে ও তাহাদের রীতিনীতি চীনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে মাঞ্চুরিয়া অবধি ও চীনের পূর্ব্ব উপকূল হইতে তিব্বত অবধি সবই এক।

পোষ্টাফিস যে স্থানে অবস্থিত তার চারি পাশেই বড় বড় দোকান। ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হইয়া এ সকল ব্যবসার দেশে চীনেম্যান ও জাপানীরা ব্যবসা করিতেছে। একটী জাপানী চিত্রকরের দোকানে কতকগুলি অতি সুন্দর সুন্দর চীন-জাপান ও রুষ-জাপান যুদ্ধের ও জাপান দেশীয় গার্হস্থ্যজীবনের এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের চিত্র দেখিলাম। চিত্রগুলি সব বড় বড় ও দেখিতে ঠিক যেন সজীব বলিয়া মনে হয়। দু'একটি রেখা দ্বারা আঁকা। চিত্রগুলি এত সুন্দর যে তাহার আবার ফটো তুলিয়া এক একখানি দশ সেণ্ট বিনিময়ে বিক্রয় হয়। তার ক্রেতা অনেক। যে যায় সেই কেনে। আমিও অনেকগুলি কিনে এনেছি। তারই দুই একখানি এই পুস্তকে ছাপাইলাম। তবে একবার ফটো ও আবার উড এনগ্রেভীং হ'য়ে আসল চিত্রগুলির প্রাণ এ ছাপাগুলিতে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। সে গুলি রঙ ফলান, জীবন্ত চিত্র,— এ ছাপা গুলি আলো-ছায়া বিহীন ছবি মাত্র।

চিত্র দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। দুই তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে জাপানীর কারখানায় ছবি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তিনিও যেন কত কালের বন্ধুর মত আমাকে সব দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমি সাহেব নহি বাঙ্গালী, একথা শুনে তার আত্মীয়তা যেন আরও বাড়িয়া গেল। একটী ঘরে একটী সুন্দর ছবি দেখিলাম, তার ফটো পাইলাম না। এমন সুন্দর সজীব ছবি আমি কখনও কোথায়ও দেখি

নাই। ছবিটির বিষয়,—"Birth of a Pearl" অর্থাৎ "মুকুতার জন্ম"। স্থির সমুদ্রের নীল জলের উপর ভাসমান একটি ঝিনুকের ডালা খুলে একটি "অনিন্দ্য-সুন্দর-মধুর-মূর্ত্তি" রমণী বলচেন—"এই যে আমি এসেছি।" বালারুণের নৈসর্গিক আভাবিশিষ্ট সেই মুখের দিকে চাহিলে সবই সজীব ব'লে মনে হয়। মনে হয় যেন, তাঁর চোখের তারাগুলি নড়চে—চোখে পলক পড়চে। যেন "সাধনার ধনকে" কে অন্তরের সহিত যুগ-যুগান্তর ধ'রে ডাকছিল; এতদিন পরে দেখা দিয়ে জুড়ালেন।

[তৃতীয় প্রস্তাব।]

জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা।

যে দিন প্রথম হংকংএ নামি, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়াছিলাম। সে চিত্রগৃহের রাস্তার ধারের দেয়ালটি, আলো যাইবে বলিয়া, কেবল শার্সিতে গঠিত,—রাস্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি সব দেখা যায়। কত লোক পথ চলিতে চলিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ছবি দেখে। আমার সেখান হইতে দেখিয়া আশ মিটিল না। পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ হইলাম।

চিত্রকর তখন সমাপ্তপ্রায় একটি ছবিতে নিবিষ্টচিত্তে তুলি বুলাইতেছিলেন। আর কতকগুলি চীনেম্যানও চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আমি ভিতরে যাইবামাত্র উঠিলেন। বোধ হয়, মনে করিলেন, ক্রেতা আসিয়াছে। ক্ষীণদেহ যুবাপুরুষ, চলচ'লে চিত্র বিচিত্র পোষাক পরা। মাথার চুলগুলি বড় বড় ও সিঁথিকাটা, কতকটা আমারই চুলের মত। সাধারণ জাপানীরা এত বড় চুলও রাখে না; এমন সিঁথিও কাটে না। বোধ হয়, কেবল চিত্রকরেরই এই দস্তুর। তিনি মিষ্ট সুরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"Good morning!" চিত্রকরের গলার মিষ্ট স্বর শুনিয়া ও তাঁহার অভিবাদনের হাবভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম, ইনি আমাকে দয়ার চক্ষে দেখিয়াছেন।

আমি প্রথমেই বলিলাম,—"আমি কিছু কিনিতে আসি নাই। সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি বাহির হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া নিকটে দেখিতে আসিলাম।" সোজা কথা শুনিয়া তিনি একমুখ হাসিয়া

বলিলেন,—"বেশ করেছেন শুভাগমন করেছেন!" "(Quite welcome!)" জাহাজে ছাড়া শিক্ষিত জাপানীর সঙ্গে কথোপকথন এই আমার প্রথম। আমার প্রত্যেক প্রশ্নের তিনি সযত্নে উত্তর দিতে লাগিলেন। বর্ম্মা ও চীনদেশে অনেক ইংরাজী-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছি; এমন সরল সুস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লন, এবং তাহার যথাযথ উত্তর দেন। সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহার সেই উত্তরগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হইল।

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীন ও জাপানী চিত্র। জাপান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ও জাপানী গার্হস্থ্যজীবনের আলেখ্য। সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কয়খানি ছবি দেখিয়া ও চিত্রকরের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহা বলিবার নয়। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার লোভ বাড়িয়া যায়, আমারও সেইরূপ হইল। যে কয় দিন হংকংএ ছিলাম, শেষ দিন ছাড়া প্রত্যহই সেই চিত্রশালায় যাইতাম। প্রত্যহই তিনি চিত্র দেখাইতেন, এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমি সাহেব নই হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়তা আরও বাড়িয়া গেল। শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবাসীকে এমনই স্নেহ ও সম্মান করেন। ভারতবর্ষ তাঁহারা অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন।

দরজার সম্মুখের ছবিখানিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি হরিণশিশু নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। শুনিলাম, নিরামিষভোজী প্রাণিহিংসাবিরহিত জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দেখা যায়। কল্পনা-লিখিত নহে। সেইখানেই আবার ঘুঘুর মত একরকম পাখী মাটী থেকে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। একটি জাপানী রমণী পুণ্য-

কম্ম-বিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের হাতে খাওয়াইতেছেন। পাখীগুলি তাঁহার হাত হইতে খুঁটিয়া খাইতেছে। পরস্পরের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস, কাহারও মনে সন্দেহ বা ভয়ের লেশমাত্র নাই। হরিণ-গুলির শিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে থাকিয়া যন্ত্রগুলি অনাবশ্যক বলিয়া আর জন্মায় না।

তাহাদের পাশেই "ক্রিসেন-থিমম্" (Crysanthemum) ফুলের প্রদর্শনীর চিত্র। এই ফুল জাপানের বড়ই প্রিয়। নানা রঙের সতেজ বড় বড় পাপড়িযুক্ত গাঁদা, সূর্য্যমুখীজাতীয় ফুল। প্রতি বৎসর এই ফুল ফুটিবার সময় দেশ জুড়িয়া উৎসব হয়। ভিন্ন-ভিন্ন-আভাযুক্ত ফুলগুলি পাশাপাশি সাজাইবারই বা কি পারিপাট্য। ছবিখানির দিকে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়।

তাহার পাশেই চেরীব্লসম (Cherry-blossom) নামক জাপানী আর এক প্রকার সুগন্ধি ছোট ফুল ফুটিবার বাৎসরিক বসন্ত-উৎসবের নৃত্যের ছবি। রমণীগণ ফুলসাজে সাজিয়া, খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরিয়া, সারিবন্দী হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সকলেরই মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। কোনও মাদকদ্রব্য না খাইয়াই যেন ফুলের গন্ধে আর মনের আনন্দে মাতোয়ারা। শুনিলাম, জাপানে ফুলের এতই আদর যে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান আছে। তাহার কত যত্ন, কত পরিচর্য্যা। প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই ফুলের আবশ্যক। কাহারও বাড়ী ফুল ফুটিলে পাড়া শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে আইসে।

তাহার পাশেই কতকগুলি বীভৎস রসের ছবি। সেইগুলি দেখিয়া কতকগুলি জাপানী প্রথার পরিচয় পাইলাম, এই যা। নয় ত আমার সে সব ছবি দেখিতে একটুও ভাল লাগিল না। খুন খারাপী, মারা-মারি, কাটাকাটি প্রভৃতি আসুরিক লীলা কি ফুলের পাশে রাখা উচিত

হইয়াছে ? শুনিলাম, জাপানে নাকি এই বীভৎস রসের আদর আছে। যাত্রা বা অভিনয়ের আসরে হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখা যায়। দর্শকবৃন্দ তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। যে ছবিগুলির কথা বলিতেছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই,—

এক জন জাপানী সামুরাই "হারাকিরী" অর্থাৎ ছোরা দিয়া আপনার পেট চিরিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। অপমানিত বা অপদস্থ হইলে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য এরূপ আত্মহত্যা করা বড়ই গৌরবের বিষয়। উপবিষ্ট অবস্থায় ছোট ছোরা দিয়া নিজের পেটে একটি সোজা আঘাত করিয়াছে। তাহা হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। দুর্বলতা-বশতঃ ঘাড়টি নত হইয়া পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যদি আপনার গলাতেও দিতে পারা যায়, বা খাপের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে গৌরবের আর সীমা থাকে না। তবে প্রথমে নিজেকে নিজে আহত করিলে পর চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুবর্গ তরবারির দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া তাহার মৃত্যুতে সাহায্য করে। নহিলে সে আস্তে আস্তে মৃত্যু আরও কষ্টকর হইত।

তাহার পরই কতকগুলি চীন-জাপান ও রুষ-জাপানের জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধের ছবি। দুর্দ্ধর্ষ জাপানী সেনার পশ্চাদ্ধাবনে ঢলঢলে পোষাক পরা চীন সেনারা উর্দ্ধশ্বাসে টিকি উড়াইয়া পালাইতেছে। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পালাইবার রকম দেখিলে এ কখনও মনে হয় না যে, যথার্থই লড়াই কি তাহারা তাহা জানিয়া লড়াই করিবে বলিয়াই সৈন্য-দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। জাপানী আঁকিয়াছে কি না, তাই হয় ত চীনেকে আরও হেয় করিয়া আঁকিয়াছে। এক একটি অগ্নিময় "বম্বশেল" সৈন্যদলের মধ্যে পড়িয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য নরহত্যা করিতেছে। এ সব ছবি যেন চোখে বিঁধিতে লাগিল।

এই সকল অশান্তিপূর্ণ বীভৎসরসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের ছবিগুলির পাশেই একটি স্বর্গীয় দূতের ছবি। জ্যোৎস্নার আধ-আলো আধ-ছায়ার একখানি জ্যোতির্ম্ময় মেঘের মত শূন্যে থাকিয়া সুষুপ্তা পৃথিবীর উপর বিশ্বের শুভকামনাপূর্ণ শান্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতেছেন। যুদ্ধের ছবির পাশে সে ছবিখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি যুদ্ধেরই শান্তি গান গাহিতেছিলেন,—

"নির্ব্বাণ হোক বৈরানল, বীরকুলের হোক কুশল ;
স্থির থাকুন ভূমণ্ডল, সুখে থাকুক প্রজাগণ।"

সেখান হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, জাপান-রাজ মিকাডো ও তাঁহার মহিষীর ইউরোপীয় পোষাক পরা প্রতিকৃতি। সুন্দরী মিকাডো-মহিষীকে এই পোষাকে বড়ই কদর্য্য দেখাইতেছে। ঠিক যেন আয়ার মত। শুনিলাম, ইনি এইরূপ বিদেশীয় সাজ-সজ্জা পরিতে বড়ই ভালবাসেন। দেশের বিস্তর লোকেরই এখন সকল বিষয়ে ইউরোপের অনুকরণে অনুরাগ। সেই জাপানী চিত্রকরের মুখে এই সম্বন্ধে আর একটি অতি বিস্ময়কর সংবাদ শুনিলাম যে, এইরূপ সজ্জায় স্ত্রী স্বামীর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পান, কিন্তু দেশীয় পোষাক পরা থাকিলে সামাজিক নিমন্ত্রণে স্বামীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়।

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বয়স্ক শিশু তার মাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া খেলার সাথীদের ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া ছুটিয়া মার স্তন্যপান করিতে আসিতেছে। মার মুখে সন্তানবাৎসল্যের ভাব ও ছেলের মুখে মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। চারি চোখে এক হইতেই দু'জনেরই মুখে হাসি। এক জন কোলে লইতে ও অপর জন কোলে উঠিতে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়াছে। অত বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কথা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে, জাপানে ছেলেরা অনেকে ৪।৫ বৎসর অবধি মাই

খায়। গরু বা অন্য পশুর দুগ্ধ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ করিতে হয়। এরূপ অপর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।

তাহার নিকটেই একটি জাপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ-আসরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলিক মদ্যপান করিতেছেন। শুনিলাম, চীনদেশের মত ক'নেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বা বর্ম্মা দেশের বা মালয়ের মত বরকে কনের বাড়ী যাইতে হয় না। চিত্রকর আমাকে কতকটা বিস্মিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দেশে কি হয় ?" আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কে সম্পর্কে বড় ?—কি হওয়া উচিত ?" আমি উভয়েরই সম্মানরক্ষা করিয়া বলিলাম,—"দুজনেরই চার্চ্চে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত। তাহাতে কাহারও মর্য্যাদার হানি হয় না।" বুঝা গেল, হাজার স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিলেও সকল দেশেই স্ত্রীজাতির একটু অবজ্ঞার ভাব লোকের অন্তরে অন্তরে থাকে ; সহজে যায় না।

তার পাশেই একটি (numery) মঠের ছবি। তার তলায় লেখা রয়েছে, (The Foundling) রাত্রি যোগে কে একটি নবপ্রসূত শিশু মঠের "অনাথ আশ্রম," দ্বারে ফেলে রেখে গেছে। ছেলেটিকে দেখিলেই মনে হয় যেন, অল্পক্ষণ হইল ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—গর্ভাবস্থার ক্লেদ এখনও তার গায়ে লেগে আছে,—এত তাড়াতাড়ি এত সন্তর্পণ। অতি প্রত্যূষে এক জন সন্ন্যাসিনী শিশুর কান্না শুনে এসে দেখে যতনে শিশুটিকে তুলে নিচ্চেন। সে তুলে লওয়ার ভাবই বা কি সুন্দর—যেন আপনারই হারাণধনকে কোলে নিচ্চেন। সুস্থকায় শিশুটি পদ্ম ফুলের মত দেখিতে। লোক লজ্জায় ফেলে গেছে বটে কিন্তু মাতৃ স্নেহ তো ফুরায় না। তাই শীত নিবারণের জন্য শিশুটির সর্ব্বাঙ্গে কাপড় দিয়ে ঢাকা। জানেন যে সে ধর্ম্ম-মন্দিরের অধিবাসিনীদের করুণার চখে পড়িলে তাঁর শিশুটির কত মা জুটিবে।

তার পাশেই বুদ্ধদেবের প্রশান্তমূর্ত্তি। ঠিক রেঙ্গুনের মূর্ত্তিগুলিরই অবিকল নকল। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ম্মার ফুঙ্গীগণই যেন "পোপ" বা শিক্ষাগুরু। চীনেও তাহাই দেখিয়াছি; এই জাপানী ছবিতেও তাহাই দেখিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কষ্ট ভাবিয়া যেন ধ্যানস্তিমিত নেত্রে জল আসিতেছে। তাঁহার আত্মা কতই মহান ছিল!—অমন মহত্ত্বের আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সন্তান-আশায় নিরাশ পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্র—অকালে সহসা প্রসূত হওয়াতে (Precipitate labor) মাতার মৃত্যু ঘটায় আজন্ম মাতৃহীন,—তাঁহার মনে যে দয়া-দৌর্ব্বল্য এত বেশী থাকিবে, তার আর বৈচিত্র্য কি! আজন্ম চিন্তাশীল স্বভাবের উপর আবার কেমন ঘটনাচক্র ঘটিল। যে পথে যান, সেই পথেই বাধা! এক দ্বারে বার্দ্ধক্য, অপর দ্বারে জরা, অন্য দ্বারে মৃত্যু দেখা দিল; শেষে নিষ্কাম যোগীর শান্তমূর্ত্তি চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গন্তব্য পথ দেখাইল। সে গতি ত আর রুদ্ধ হইবার নয়! অন্তরের একান্ত আগ্রহে একে একে কত পথই খুঁজিলেন। শাস্ত্রের উপদেশ মুক্তি-পথের সংবাদ দিতে পারিল না। কঠোর তপস্যাতেও শান্তি আসিল না। ধীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সে সমস্যা পূর্ণ হইল। মহান্ জীবনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধ্যানমগ্ন কাঁদ-কাঁদ মুখ-খানিতে লেখা দেখিলাম।

তাহার পাশেই দেখি, বিজ্ঞানগুরু হার্‌বার্ট স্পেন্‌সারের সৌম্যমূর্ত্তি অঙ্কিত। চুলগুলি সব পাকা, বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষুর জ্যোতিঃ কিছুমাত্র নিষ্প্রভ হয় নাই। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, যেন জ্ঞানজগতের কি তত্ত্ব-উদ্ভাবনে রত। ইনি সমস্ত মানবের বন্ধু,—বিশেষ জাপানের পরম বন্ধু ছিলেন। যেমন হইয়া থাকে, নাস্তিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। দেহের কান্তি যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত কৃষক-তনয়া "ডোরা"র প্রতিকৃতি।

শস্যক্ষেত্রে বালিকা • পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া যত্ন করিতেছেন। শিশুর পিতাকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান পান নাই। একা ব'সে আপনার মনের মতন ক'রে ছেলেটির মাথায় বনফুলের মুকুট প'রিয়ে দিচ্চেন। আর সেই সময়ে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—

"—And the reapers reaped,
And the sun fell,
And all the land was dark."

অর্থাৎ,—"সে বৎসর ষোল আনা ফসল হইয়াছিল,—তাই কৃষকেরা মনের আনন্দে শস্য কাটিতেছিল। ক্রমে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়িলেন—দিঘ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।"

তার পাশেই বাইবেলে উক্ত "রুথের" ছবি। বিদায়কালে মরুভূমির মধ্যে শাশুড়ীকে মিনতি করিতেছেন,—"আমাকে ছেড়ে যেও না।" বিদেশে স্বামী-পুত্র সব হারাইয়া শ্বশ্রূ বলিতেছেন,—"সব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি আমার দেশে যাচ্চি মা, তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও।" রুথ মরুভূমির পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার হাত দুইটি ধ'রে ব'লচেন,—"Wherever thou wilt go, I will go,—thy country is my country,—thy people, my people—and thy God my God."

অর্থাৎ,—"তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব। এখন তোমার দেশই আমার দেশ হইয়াছে। তোমার আত্মীয়-স্বজনই আমার কুটুম্ব। তোমার যিনি উপাস্য দেবতা আমারও তিনি আরাধ্য।"

তাহার পার্শ্বেই কবিগুরু মিল্টনের "Paradise Lost"এর একখানি ছবি। অতি প্রত্যূষে সুপ্তোত্থিত অ্যাডাম সুষুপ্তা ইভকে জাগাইতেছেন। তরুণ অরুণের লোহিত আভা মানব-জননী ইভের মুখে পড়িয়াছে;

দুঃস্বপ্নের অশান্তিরেখা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অ্যাডাম অতি আদরে গা ঠেলিয়া নানারূপ প্রিয় সম্বোধনে ইভ্‌কে বলিতেছেন,

"————Awake,

My fairest, my espoused, my latest found,

Heaven's last best gift, my ever new delight,

Awake, the morning shines."

অর্থাৎ—"ধর্ম্মপত্নী উঠ, তুমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্য্যের আধার, সবে মাত্র তোমায় পেয়েছি—স্বর্গ হতে সর্ব্বের শেষ, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান তুমি, যখনই দেখি মন আনন্দে ভরে যায়।—গা তোল—সকাল হয়েছে যে।"

অপর প্রাচীরে আর কতকগুলি অতি সুন্দর ছবি ছিল। তার মধ্যে প্রথমেই "হেলেনের জন্ম" ("Birth of Hellen")। ছবিখানি কিছু অশ্লীল। তবে ভাবুকের চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ম, সকল সৌন্দর্য্যই পবিত্রতা মাখান। তাই, বোধ হয়, হংকংএর রুচিপুলিস আপত্তি করে নাই। নদীর ধারে উত্তেজিত হংসরাজ গ্রীবা বাড়াইয়া সাগ্রহে চঞ্চুপুটে আবেশ-অবসন্ন "লীডা"র অধরোষ্ঠ ধরিয়াছেন। তাহার ডানা দুটি মেলান ও পক্ষিশরীরের পক্ষরাজি কণ্টকিত।

তাহার পার্শ্বেই ("Water Baby") "জলের শিশু"। জলদেবীর প্রথম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিতেছে। মা যেন অনভ্যস্ত আড়ষ্টের মত, ছেলে নিতে জানেন না। তার ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে—চুলগুলি সব ভিজে গিয়েছে। ছোট ছেলের দুঃখকষ্টহীন কান্নার রেখাগুলি শিশুর মুখে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। আর তাঁহার নিজের শরীর গোলমালে প্রায় বিবস্ত্র। ছেলেটিকে সম্মুখে রেখে বিমূঢ়ের মত এক পা জলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিস্ময় ও সন্তান-স্নেহের নূতন আবির্ভাবে অপূর্ব্ব প্রীতিমাখান মুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, এতদিন যেন তা জানতেন না।

"স্নানাগারে জাপানী রমণী"র ছবিতে দেখিলাম, বুকের বোতাম

স্নানাগারে জাপানী রমণী।

খোলা ফ্রক পরিয়া একজন রমণী স্নানাগারে যাইতেছেন। শুনিলাম, জলে নামিবার সময় সাধারণ স্নানাগারে সকলের সামনেই বিবস্ত্রা হইয়া নামিতে হয়—জাপানে এইরূপ প্রথা। ইচ্ছা করিয়াই বুকের কাপড় ঈষৎ খোলা। মুখে কূট হাসি। যে কেহ তাঁহার দিকে তাকায়, সেই মনে করে, যেন তাহারই দিকে অনুরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া হাসিতেছেন! আর নীচের ঠোঁটের মধ্যভাগ লাল রঙ্গে চিত্র করা। ঐ প্রথাটি চীনেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে পায়ে আল্‌তা পরে। ইউরোপে গালে রক্তিম আভা লাগায়। কিন্তু ঠোঁটে এমন মধুর চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

পাশেই "ফুজীয়ামা"র গগনস্পর্শী চূড়া মেঘলোক

তাহারই মধ্য হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উৎপাত মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। অহরহঃ ভূমিকম্প হয়। গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সহিত ভীষণতার সংমিশ্রন। পর্ব্বতটি সহরের অনতিদূরে অবস্থিত, সর্ব্বদাই দেখা যায়। আমাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্থান; জাপানের পরম পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য।

তাহার পাশেই একটি "Lake-side Villa" অর্থাৎ, হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী আবাসগৃহ। ছোট একতালা গৃহটির ঢালু ছাদ চীনে ফ্যাশানের মত,—ধার ও কোণ উঁচুকরা। চারি পার্শ্বে বাগান ও ফুলের গাছ। স্বচ্ছ জলে কুটীরটির ছায়া পড়িয়াছে। দূরের পাহাড় ও পার্শ্বের গাছও সেখানে প্রতিভাত হইতেছে। দুই একখানি পাল্-তোলা নৌকা জলে ভাসিতেছে। সবগুলিই দুই একটী রেখায় আঁকা। তাহাতেই কত সজীবতা, কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। জাপানী চিত্রের এইরূপ সরলতাই পরম গুণ। ছোট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন সেই কুটীরটি দেখিলে মনে হয়, যেন সেটি যাবতীয় পার্থিব সুখের আলয় ও শান্তির ধর্ম্ম-মন্দির। রুগ্নের বা ব্যথিতের শেষ জীবন কাটাইবার উপযুক্ত স্থান।

মঙ্গোলিয়ান দেশের দোকানে এত ককেশিয়ান ছবি রাখা হয় কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর বলিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেই এই সকল ছবির ক্রেতা অধিক। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই গিয়াছেন। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য অনেক দিন ছিলেন। অনেকগুলি চিত্র ইটালীয় আদর্শে আঁকা। "Birth of Hellen", "Water Baby" ও "Birth of a Pearl" সেখানকার আদর্শে আঁকা। আমি তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কতকগুলি ছবির পুস্তকে দেখিয়াছি।

এই জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আমি জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। সে শিক্ষার উপকারিতা এই যে, বর্ম্মা, মালয় ও চীনদেশের সঙ্গে তুলনায় তাহা কিরূপ দাঁড়ায়, এই বুঝা। দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা একরূপ; যেন সকলগুলি মঙ্গোলিয়ান জাতি বলিয়া এমন মিল হইয়াছে। যে যে বিষয়ে মিল ও যে যে বিষয়ে অমিল, সে কথা পরে বলিব।

শেষ যে ছবিখানি দেখিলাম তার সৌন্দর্য্য ও সজীবতার তুলনা নাই—কল্পনারও অতীত। এই ছবি খানির কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। বিষয়টি "Birth of a Pearl" অর্থাৎ,—"মুক্তার জন্ম"। দেখেই মনে হলো চিনি— আর কোথায় যেন দেখেছি। নিনিমেষ নয়নে দেখতে দেখতে কে জানে কেন, চোখ জলে ভরে গেল।—আর ঠিক্ কি মনে হলো, ছবির সে রং ফলান চোখেও যেন জল এলো!

হংকং ।

[চতুর্থ প্রস্তাব।]

পোষ্টাফিসের সামনের স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর; তথায় জনতার অবধি নাই। পিনাঙ ও সিঙ্গাপুর অপেক্ষা এ সকল স্থানে অনেক উচ্চ-বংশীয় ধনী চীনেম্যান বাস করে। তাদের পোষাক সাধারণ চীনেম্যানের পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেকটা অন্যরূপ। তাদের ইজের অত ঢল ঢ'লে নয়,—যেন পা'জামার মত,—গোড়ালীর কাছে আঁটা। তার উপর রঙ্গিণ কাপড়ের এক আলখেল্লা পায়ের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাদের টুপী আমাদের এদেশী "ফেল্ট ক্যাপের" মত, তার উপরে একটী গোলাকার বলের মত দ্রব্য আঁটা। এইটিতেই পদবী সূচনা করে। যাদের বল যত বড়, তারা তত উচ্চ পদবীর লোক। ক্যাণ্টন সহরের স্ত্রীলোকেরা ভাল ভাল কালো রেশমের পোষাক পরিয়া অতি সুন্দর রূপে চুল বিনাইয়া অনাবৃত মস্তকে পদব্রজে বা রিক্‌স গাড়ী চড়িয়া, একলা স্বাধীন ভাবে এ দিক ও দিক যাতায়াত করেন। সুসজ্জিত হইয়া দোকানে দোকানে রেশমের কাপড় কিনিয়া বেড়ান তাঁহাদের একটা বাতিক। তাঁদের মুখের মধুর ও গম্ভীর ভাব আমি অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। অন্য জাতীয় অনেক স্থানের স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিয়াছি, সুসজ্জিত হইয়া স্বাধীন ভাবে ঘরের বাহির হইলেই নটীভাব যেন আপনা আপনি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।

হংকং পথে অসংখ্য গোরা-সৈন্য ও নৌ-সেনা দেখিতে পাওয়া যায়। হংকং অতি সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত সেনা-নিবাস। যে স্থানটিতে কেল্লা ও সেনা-নিবাস আছে, সে স্থানটিকে কাউলন বলে। অনেক

সিপাহী-সৈন্যও সেখানে ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়া সপরিবারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আর একটি দেখবার জিনিষ,—ইউরোপীয় রমণীদের নিজ নিজ চীনে ডুলিবাহক ও রিক্‌সওয়ালাকে সুন্দর সুন্দর পোষাকে সাজানর যত্ন। ধব্‌ধবে সাদা খাটো ঢল-ঢ'লে ইজের ও কোটের ধারে ধারে টুক্‌টুকে লাল রঙের ফিতা বসান। বুকে ও হাতের নীচে নীল জরির কাজ করা। ছোট ছোট লাল রঙের পৃষ্ঠবস্ত্র। কোমরে নীল মখমল বসান কোমর-বন্ধ। মাথায় লাল ও নীল ডোরা ডোরা তেকোণা টুপী। সুগঠন পা'দুখানি অনেক দূর অবধি অনাবৃত। সুন্দর সুন্দর রিক্‌স ঠেলিয়া বা বেতের "সিডান চেয়ার" কাঁধে করিয়া ক্ষিপ্র পদ-বিক্ষেপে এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছে। সে ছবি দেখিলে আর চোখ ফিরান যায় না। কে জানে কেন চীনেম্যানের গায়েই যেন সাজান মানায়। সকলেই তাদের দিকে চেয়ে দেখে,—কেহই তাদের কর্ত্রীর দিকে চায় না।

পোষ্টাফিসের সামনেই ফুলের বাজার। রাশি রাশি বিভিন্ন জাতীয় অতি সুন্দর সুন্দর স্তূপাকার ফুল লইয়া চীনে স্ত্রীলোকেরা বেচিতেছে। তার অধিকাংশ ফুলই দেখিতে সুন্দর; কিন্তু সুগন্ধযুক্ত নহে। লিলী কন্‌ভলভুলস প্রভৃতির আকৃতি আমাদের এদেশের ঐ ফুল অপেক্ষা অনেক বড়। কেমন ক'রে অমন পাতরের দেশে এমন সুন্দর সুন্দর ফুল জন্মিল, বুঝা যায় না। ক্রেতার মধ্যে চীনেম্যানই বেশী। তারা বড় ফুল ভালবাসে; স্থানাভাবে বারান্দায় বাগান করে। নিজেদের দোকানের ভিতর সুন্দর সুন্দর ছোট কাচকড়ার টবে করিয়া আইরিস গাছ আজ্জায়। ছোট গাছে বড় বড় ফুল ফুটিয়া কি সুন্দরই দেখায়!

সহরের রাস্তাগুলি দেখলাম, সব পাতরে বাঁধান; ভাঙ্গিয়া গেলে রাজমিস্ত্রিতে মেরামৎ করে। রাস্তা, ঘাট, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি সবই পাতরের; তাই অল্প তাতেই গরম হইয়া উঠে। তবে সমুদ্রের ধার

ব'লে কতকটা রক্ষা। আমাদের মথুরাও অনেকটা এই রকম। তবে এখানে পথ চলিবার কষ্ট নাই ; কারণ সব ফুটপাথগুলি বারান্দার মত ঢাকা, ছাতওয়ালা,—সেথান দিয়া বরাবর চলিলে রৌদ্রবৃষ্টি গায়ে লাগে না। বাড়ীগুলি খুব উচু উচু, তার নীচে দোকান ও উপরে থাকিবার স্থান। সব বাড়ীগুলিই গায়ে গায়ে, চারিপাঁচতলা উচু। নীচেতলার ভাড়া অসম্ভব বেশী। একটী দরজাওয়ালা ছয় কি সাত হাত লম্বা একটী ঘরের মাসিক ভাড়া ৫০ ডলার। বাড়ীর উপর তলার ভাড়া কম। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরকার বারান্দা টবে করা ফুল গাছে পরিপূর্ণ। জনতাপূর্ণ দোকানের টেবিলেও ছোট সুন্দর কাজ করা টবে ছোট আইরিস্ গাছ ফুলে ভরা। ফিরিওয়ালাও পথে পথে ফুল গাছ ফিরি ক'রে বেড়ায়। ফিরিওয়ালার সংখ্যা নাই। সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যেরই ফিরিওয়ালা ঘুরে। তাদের সকলকেই দেখতে গম্ভীর ও নিজ নিজ কাজে নিবিষ্টচিত্ত। সকলেই হাঁকে বা এক এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ ক'রে আপনাদের আগমন-বার্ত্তা জানায়। কামার ছোট ছোট লৌহ নির্ম্মিত ঝুমঝুমী বাজাতে বাজাতে যায়। ছুতোর দুটী কাঠে শব্দ করে। ফলওয়ালা ফলগুলি ছাড়িয়ে, তার আঁটি বাদ দিয়ে, ছোট ছোট খণ্ড করে, একটী কাঠিতে বেঁধে, তাই ফিরি করে,— তার সঙ্কেত ভাঙ্গা গলার ডাক। যে কাণ হ'তে খোল বার করে, সে মধুর স্বরে হাঁক দেয়। যে গল্প শুনায়, সে একটী বেহালা বাজাইতে বাজাইতে যায়। যে ভাগ্য গণনা করে সে রঙ্গিণ পোষাক প'রে যায় ; তার স্বর যেন স্তুতি গানের মত। যে গান শুনায় সেঁ নিজে গান গাহিতে গাহিতে যায়। সেই সকল শব্দ উচু সারবন্দী দু'ধারের বাড়ীর মধ্যকার অপ্রশস্ত পথে প্রতিধ্বনিত হয়। সে অবিশ্রান্ত জনতার দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন পিপীলিকার সার দেখচি।

হংকং প্রভৃতি চীনে মুলুকের সব দেশেই রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত।

তার কারণ, মানুষের পরিশ্রমের দাম এত কম যে, সকল রকম কাজই মানুষে করে। গাড়ী টানিবার ও মোট বহিবার জন্য ঘোড়া বা গরুর আবশ্যক হয় না। হংকং সহরটীর প্রায় সবই সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে অবস্থিত। কেবল মাত্র ৪৮০ হাত চওড়া এক খণ্ড সমতলভূমি সমুদ্র ও পাহাড়ের মাঝে ব্যবধান। এই টুকু ছাড়া রাস্তা, গলিঘুজি সবই পাহাড়ের রাস্তার মত উচু নিচু ; সুতরাং সে সকল স্থানে গাড়ীও কোন কাজে আসে না। তাই বেতনির্ম্মিত ও কাঁধেবওয়া সিডান চেয়ার নামক এক রকম চেয়ার পাহাড়ে উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে অনেকটা ভারতবর্ষীয় পার্ব্বত্য দেশের ডাণ্ডির মত। চীন দেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোকেরা সুন্দর সুন্দর কাজ করা রেশমের পোষাক পরিয়া ও অতি চিকণ করিয়া চুল বিনাইয়া একলা স্বাধীন ভাবে দোকানে দোকানে গন্ধ দ্রব্য, অলঙ্কার, রেশম ইত্যাদি সাজ সজ্জার জিনিষ কিনিয়া বেড়ায়। তাহাদের মুখশ্রী ও হাব ভাবে গাম্ভীর্য্য ভরা। অত যে লোক-জন ক্রেতা-বিক্রেতা, দোকানে কিন্তু টু-শব্দটী নাই। কাহারও মুখে উচ্চ কথা নাই। কেবল মৌমাছির চাকের মত অস্পষ্ট একটী শ্রুতি-মধুর শব্দ রাস্তায় শোনা যায় মাত্র।

কলিকাতার মত হংকং সহরেও বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে ; কিন্তু পাহাড়ে উঠিবার ট্রাম সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহাকে "পিক্ ট্রেণ" অর্থাৎ পাহাড়ের রেল বলে। সমতল ভূমির নিকট হইতে প্রায় ১৫০০ শত ফিট উচ্চে সেই ট্রাম উঠিয়াছে। তাহা বাষ্প বা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে না, মোটা তার দিয়া টানিয়া তোলা হয়। পাশাপাশি দুটি রেল, একটী দিয়া একখানি গাড়ী উঠে ও ঠিক সেই সময়ে অপরটী দিয়া অপর এক খানি নামে। পাহাড়ের উপরে একটী এঞ্জিন আছে ; সেইটী একই সময়ে একটীকে টানিয়া তুলে এবং অপরটীকে নামাইয়া দেয়।

সে ট্রামে চড়িয়া উঠা-নামা বড়ই আমোদজনক। গাড়ীগুলি মৃদু

ভাবে চলে—কোনও রূপ ঝাঁকানি নাই। কখনও বা ঈষৎ বক্র কখনও বা অতিবক্র স্থান দিয়া উঠিবার সময় বড়ই আনন্দ বোধ হয়। নীচের দিকে তাকাইলে চক্ষুর সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। সহরের বড় বড় অট্টালিকাগুলি সব স্তরে স্তরে দাঁড়াইয়া। দূরে বন্দরের নীলাভ জলে শত শত জলজান ভাসিতেছে। বড় বড় অর্ণবপোতগুলি যেন ছোট ছোট মোচার খোলার মত দেখাইতেছে। তীরের চারিধারে অসংখ্য কলকারখানা হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উদ্ধোৎক্ষিপ্ত হইতেছে। রেলের আসে পাশে নানা জাতীয় গাছ। সেই পাহাড়ের উপরেই গোরা সৈন্যদের জন্য সেনা-নিবাস।

উপরের ষ্টেসনটী অতি সুন্দররূপে সাজান, যেন বসিবার বৈঠকখানা। প্রতি দিন কতলোক নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য এই সকল স্থানে আসে। অনেক চানে ও ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণী পাহাড়ের উপর বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বা পথশ্রান্তি নিবারণের জন্য আবরণবিশিষ্ট কাঠের বেঞ্চে বসিয়া নীচের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সেখানকার হাওয়া অতি শীতল ও অতিশয় নির্ম্মল, সেবন করিলে দেহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়। অথচ মাথায় রৌদ্রের তাপ অসহ্য বলিয়া মনে হয়। পার্ব্বত্য দেশ মাত্রই এইরূপ। তাই বসিবার বেঞ্চের উপর আতপ নিবারণের জন্য আবরণ নির্ম্মিত।

নীচে যেমন আফিস্, দোকান, কলকারখানা,—তেমনি এই পাহাড়ের উপরই ধনী লোকের বসতি ও প্রমোদ উদ্যান। ছবির মত বাড়ীগুলির সংলগ্ন এক এক খণ্ড ফুলের বাগান ও টেনিস্ খেলিবার জন্য খানিকটা খালি জমি ঘেরা আছে। এক এক স্থানে এক একটী উচ্চ মঞ্চের মত গাঁথা আছে,—সেই খানে বসিয়া বন্দরের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া আরাম করিবার জন্য কাষ্ঠাসন পাতা।

আমরা সাড়ে আঠার শত ফুট অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিলাম।

সেখানে একটী মানমন্দির আছে। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য এই স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। তাহার কারণ উচ্চ পাহাড়টির চারি দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া নভোমণ্ডল সুন্দররূপে পরীক্ষা করা চলে। চারি দিকেই উন্মুক্ত স্থান বলিয়া দৃষ্টির গতিরোধ হয় না। হংকংএর মত বড় বন্দরে নক্ষত্রাদির ও ঝড়-তুফানের গতি-বিধি নির্দ্দেশ করিবার আড্ডা একান্ত আবশ্যক—অর্ণবপোতের গমনাগমন দিঙ্‌নির্ণয় ও স্থান ও সময় নির্দ্দেশে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার জন্য সেখানে দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র ও লোক জন থাকে। কলিকাতায় যেমন দিন ১টার সময় তোপ পড়ে—এ সকল স্থানে তেমনি ১২ টার সময় তোপ হয়। পাহাড়ে উঠার শ্রান্তিতে আমার বড় পিপাসা পাইল। একটী ছোট চীনে মেয়ে আমাকে সোডাওয়াটার এনে দিল এবং সঙ্কেতে আঙ্গুল দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, ২০ সেণ্ট তাহার মূল্য।

সে স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিলে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখের সামনে খুলিয়া যায়। অদূরে চীন-সম্রাটের শাসনাধীন পর্ব্বতময় দেশ। মাঝে সমুদ্র ব্যবধান। তার পরই হংকং সহর কেবল ঘর বাড়িতেই পরিপূর্ণ ঢালু জমিতে বাড়িগুলি সব স্তরে স্তরে সাজান। আর সেই পাহাড়টির অর্দ্ধপথে বটানিকাল গার্ডেন অবস্থিত—কত গাছ-পালায় সবুজ হইয়া রহিয়াছে। ঠিক তাহারই উপর একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত-চূড়ায় একটি ছোট স্রোতস্বিনীর জল দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকরে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই জলের স্রোতই প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় আটক করিয়া হংকং সহরে পানীয় জল জোগান হয়। পীনোন্নত পর্ব্বত-শিখরের উপর জলধারাটি অতি সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন সঞ্জীবনী সুধার উৎসের মত, ঠিক যেন মাতৃবক্ষে সুধাধারার মত। তার নীচেই বটানিকাল গার্ডেনের সবুজ গাছ পালাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন, হংকং সহর

চির কৃতার্থ হ'য়ে তাঁর চরণতলে সৌন্দর্য্যের ডালি ধ'রেছে। হৃদয় তো দেখান যায় না। মনের ভাব অমনি করেই ফুটে বেরোয়।

যতদিন হংকং সহরে ছিলাম, সেখানে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। কোন কোন দিন সেখান হইতে ফিরিবার সময় পদব্রজে বটানিকাল গার্ডেন বেড়াইয়া আসিতাম। উহা ঐ পাহাড়ের মধ্যদেশে অবস্থিত বলিয়া আসিবার পথেই পড়ে। সেখানে কত রকমের ছোট বড় গাছ ও ফুল দেখা যায়। তার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাপান দেশের "Dwarf plant" (বেঁটে গাছ) নামক তাল ও নারিকেল জাতীয় ছোট গাছ গুলি এখানে সতেজে জন্মে। "বেম্বুসা" নামক অতি ছোট বাঁশের ঝোঁপগুলি ঠিক ঘাসের ঝোপের মত দেখিতে। সেখানকার ঘাস গুলি ঠিক আমাদের ঘাসেরই মত। তাতেও ফড়িঙ্ লাফায়। পদ্ম জাতীয় এক রকম গাছ ঝরণার জলস্রোতে জন্মে—কিন্তু তার ফুল গুলি সুস্থ ও সতেজ হইলেও ভাল করিয়া ফুটে না। তারাও যেন চীন জাতীয় স্ত্রীলোকের সরল বিনয়-নম্র লজ্জাশীল স্বভাব পাইয়াছে।

সেই পাহাড়েরই এক স্থানে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। স্থানটি বড় বড় গাছের ঘন পাতার আবরণে ঢাকা একটি কুঞ্জবনের মত। তার ভিতর দিয়া পথ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-পাতরে বাঁধান পথের ধারেই পাতরে বাঁধান পয়োনালি দিয়া একটি ছোট ঝরণার জল ঝর্ ঝর্ রবে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকের উচ্চ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে সে স্বরটি অতি শ্রুতিমধুর হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে বৃক্ষশাখায় পাখীর গান। পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে সেই সব গাছের ডালে ব'সে গান করে; ক্লান্ত হ'লেই সেই পাতরের উপরকার নির্ম্মল জলস্রোতে ঠোঁট ডুবিয়ে জল পান করে। তার মধ্যে অনেকগুলি পাখী ঠিক আমাদের দেশের

বুল্‌বুল্‌ ও কোকিলের মত দেখিতে। স্বরও অনেকটা সেই রূপ। ঘন ছায়াযুক্ত সে স্থানটি এত শীতল যে মনে হ'তে লা'গল পাতরে শুয়ে খানিকটা ঘুমাই। সে স্থানটি কিছু ভিজে বলিয়া তার চতুর্দ্দিকেই নানা রংএর সেওলা—"মস্‌" ও "ফার্ণ" রাশি রাশি জন্মিয়াছে। একটি চীনেম্যানের ছেলে সেই খানে, এক খানি ভিজে সেওলা ঢাকা পাতরের ধারে ব'সে ইস্কুলের পড়া প'ড়ছিল,—

"Thou fliest the vocal vale,
An annual guest in other lands
Another Spring to hail."

"হে পিকবর! যেমন বসন্ত ফুরায় অমনি তুমিও এ দেশ হ'তে পলাও। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসন্তের শুভাগমন গাহিবে বলিয়া তুমিও সেখানে গিয়া অতিথি হও।"

নির্জ্জন স্থানে অসীম অনন্তের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্টতর হয়। তাই নিস্তব্ধ নির্জ্জন বলিয়া এই স্থানে প্রায়ই বেড়াইতে আসিতাম। এক দিন ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি ঝোপের ভিতর একটি জোনাকী পোকা দেখিলাম; এরূপ আমাদের দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে দেখি। একাই উড়িয়া উড়িয়া জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। আমাদের দেশের খদ্যোতের মত সতেজ ও উজ্জ্বল নয়। অনেকটা হীনপ্রভ ম্লান ও ম্রিয়মান—যেন স্বাস্থ্য হারাইয়া দেশে দেশে স্বাস্থ্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

আর একদিন দ্বিপ্রহরে অতি প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে একটী ছায়াতরুর তলায় বেঞ্চে বসিয়া আছি,—এমন সময় দূর হ'তে এক প্রকার ভারী চাপা গলার করুণ ডাক শুনিলাম। সে শব্দ যেন আমাদের দেশী বন্ধুর গলার মত চিরপরিচিত ব'লে মনে হলো। বহুদিন পূর্ব্বে যখন আমি স্বাস্থ্য, আশা ও উৎসাহ লয়ে বৃন্দাবন,

মথুরা ও জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন সে সব স্থানে অসংখ্য ঘুঘু-মিথুন দেখে তাহাদের মধুর রব আমার কাণে চিরপরিচিত হয়ে গেছে। বিজন স্থানে সে মর্ম্মভেদী চাপা গলার কাতর ডাক শুনিলে সকল লোকেরই মনে কেমন এক অন্যমনস্ক ভাব আসে। কি যেন এক পুরান স্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে মনে জাগে। মনে হয়, কিছু যেন হারাইয়াছি,—তাহা মনে আসিয়াও আসিতেছে না। আজ হংকংএও সেইরূপ হলো। কালিদাসের এই কবিতাটী তখন আমার মনে পড়িল,—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥"

শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গিয়া দেখি, পিঞ্জরাবদ্ধ দুইটি ঘুঘু বিভিন্ন খাঁচায় পৃথক থাকিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পরের দিকে ফিরিয়া ঐরূপ মধুর শব্দ করিতেছে!

হংকং।

[পঞ্চম প্রস্তাব।]

হংকংএ অনেক দিন ছিলাম। সেই অবসরে উচ্চবংশীয় ধনী চীনে পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের রীতিনীতিগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করার প্রতি আমার সতত চেষ্টা ছিল। জাহাজের ধনী চীনে যাত্রী ও চীনে কর্ম্মচারীদের সাহায্যে সে সুযোগও ঘটিয়াছিল। এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক জন চীনে বন্ধুর সহিত একটী উচ্চবংশীয় চীনে পরিবারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। হংকংএর এক প্রান্তে তাঁহাদের বাস। চীনরাজ্যে ও হংকং সহরে তাঁহাদের অনেক ভূমি ও ধন-সম্পত্তি আছে। হংকংএ ব্যবসাসূত্রে বাস। গৃহস্থ অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর অধিকারী বাড়ী ভাড়া হইতেই তাঁহার মাসিক আয় বিশ হাজার ডলার। সেখানকার যত বড় বড় আফিস, সব তাঁহাদেরই বাড়ীতে।

যে বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন, সে বাড়ীর নিম্নতলায় তাঁহাদেরই আফিস। উপর তলায় বাস। সন্ধ্যার সময় আফিস বন্ধ ক'রে তাঁহারা উপর তলায় সকলে মিলিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদের আগমন-বার্ত্তা না জানাইয়াই আমরা তাঁহাদের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলাম। নীচেকার লোকজন গুলি আমাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল না, —এমন কি একবার একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

সংবাদ না দিয়া এবং বিনা নিমন্ত্রণে যে একেবারে তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিস্মিতও হইলেন না; বরং হাসিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া মেয়ে-পুরুষে আমাদের অভ্যর্থনা

করিলেন। যে ঘরে তাঁহারা কার্য্যান্তে বসিয়া একত্র গল্প-গুজব করিতেছিলেন, সে ঘরটী অতি পরিপাটীরূপে সাজান। দেওয়ালে ভীষণকায় গোঁফ-ওয়ালা চীনে দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকা। দেওয়ালের ধারে ধারে চেয়ার এবং কোণে টেবিল, ঘরের মাঝখানটা সব ফাঁকা। মেজে অতি চিক্কণ মার্বেলে বাঁধান; তাহাতে ম্যাটিং নাই। কড়ি হ'তে চীনে লণ্ঠন ঝুলান, — মাঝে মাঝে আবার বিলাতী আলোও জ্বলিতেছিল।

বৈঠকখানায় চা-পান।

ঘরে দুইটী রমণী, দুইটী পুরুষ ও কতকগুলি ছোট ছেলে মেয়ে ছিল; সকলেই সুসজ্জিত ও সুশ্রী। বাড়ীর কর্ত্তাটির বয়স ৩০।৩৫ বৎসর হইবে। দেখিতে খুব সুশ্রী, পাতলা ও ঢেঙা। গৃহিণীর বয়স বিংশতির উর্দ্ধ হইবে না। মুখশ্রী ও হাবভাব যতদূর সরল হওয়া সম্ভব, তাহা তাঁহার মুখে দেখিলাম। কাল রেশমের পোষাক পরা, সুন্দর ক'রে খোঁপা বাঁধা। মুখে নির্দ্দোষ হাসি ফুটে বাহির হ'চ্ছে। দৃষ্টিতে যেন আগন্তুকদের জন্য অভ্যর্থনা মাখান। তিনি ইংরাজী জানেন না। যে বন্ধু আমাদের সঙ্গে ক'রে তথায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি চীনে

ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, আগন্তুক লোকটী ডাক্তার,—কলিকাতা থেকে চীনদেশ দেখ্‌তে এসেছেন। আর সদ্বংশীয় চীনে পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাই সঙ্গে আনিয়াছেন। শুনিয়াই অভিবাদন পূর্ব্বক আবার তিনি ঘাড় নীচু করিলেন। আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম।

যাইবার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ছোট পেয়ালা করিয়া ঠাণ্ডা, দুধ ও চিনিবিহীন স'বজে চা সকলের হাতে দেওয়া হইল। এইটি তাঁহাদের অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার ধান-দূর্ব্বা স্থানীয়। ইহা ঘরে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা হয়। সে চা-র গন্ধ অতি মনোহর, কিন্তু উহা কষা আস্বাদযুক্ত ও অতিশয় উত্তেজক। আবার পাঁচ মিনিট পরেই তখনি তৈয়ার করিয়া এইরূপ গরম চা সবাইকে দেওয়া হইল। চা-র পেয়ালাগুলি ছোট ছোট উনানে বসান—সব শুদ্ধ হাতে লওয়া যায়। তাহা হইতে ভুর্‌ভুরে গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমি কখনও চা পান করি না, কেবল এক চুমুক মাত্র খাইলাম। চা খাই না শুনে তাঁরা যারপর নাই বিস্মিত হলেন।

এইবার তাঁহাদের অহিফেন ধূমপান করিবার সময় আসিল। ইহার জন্য ঘরের এককোণে বাশের তক্তপোষ আছে। তাহার উপর মাদুর বিছান। তার মাঝে একটী বড় কাচকড়ার রেকাবীতে একটী চিমনীযুক্ত তৈলের ল্যাম্প আছে। কেরোসিন নয়, অন্য দেশী তৈল জ্বলে। আর সেই ল্যাম্পের চারিধারে দুই একটী চীনেমাটীর পুতুল সাজান। তারমধ্যে একটী পা ভাঙ্গা চীনে রমণীর প্রতিমূর্ত্তি। গৃহকর্ত্তা সেই মাদুরে গিয়া বসিলেন। ধূম-পানের জন্য বাঁশের একটী মোটা নল সেই খানেই ছিল। সেটী প্রায় তিন ফুট লম্বা ও দেড় ইঞ্চি মোটা। ইহার মাঝে একটী গর্ত্তে একটী ফানেল বসান। তাহার ভিতরই মোমের মত নরম আফিমথণ্ড অন্য কি কি দ্রব্যাদির সহিত মিলাইয়া রাখিতে হয়। একটী

কাঠী করিয়া আফিম এইরূপ মিলাইবার সময় ভাবী ধূমপানের আশায় মুখে আনন্দ আর ধরে না। তখন হইতেই তিনি যেন উত্তেজিত হইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—ঘন ঘন হাসিতে লাগিলেন। সেই চোঙ্গাস্থ ফানেলের ভিতর দিয়া এই আফিমটুকুর ধূম পান করিতে হয়। তাহাতে হঠাৎ নেশা এত প্রবল হয় যে, আগে মাদুরে শুইয়া পড়িয়া তবে ধোঁয়া টানিতে হয়। মাথায় থাকে পোরসিলেনের বালিশ,—তুলার বা অন্য কোনও নরম দ্রব্যের বালিশ তখন ব্যবহৃত হয় না। সেই আফিমযুক্ত ফানেলের মুখটী ল্যাম্পের চিমনির উপর ধরিলেই জ্বলিয়া উঠে ও তাহা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হয়; আর ঠিক ইত্যবসরে নলে মুখ দিয়া সজোরে টানিতে হয়। এক বার আধবার নয়,—অনেকবার টানা চলে। সে সময়ে ঘরটী ধূমে ধূমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। যাহারা অভ্যস্ত নয়, সে ধোঁয়াতে তাদের বিলক্ষণ কষ্টবোধ হয়। যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। যেন মাথা ঘুরে আসে। যেন আঘ্রাণেও ঈষৎ নেশা হয়। ধূমপান শেষ হইলে, গরম চা-পান করিয়া কর্ত্তা আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ নেশার আবির্ভাব হয়,—অল্পক্ষণ মাত্র থাকে, নেশায় অভিভূত হইতে হয় না।

কর্ত্তার ধূমপান শেষ হইলে গৃহিণীও ধূমপান করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধূমপান অন্যরূপ। পালিস করা পিত্তল নির্ম্মিত একটী যন্ত্রে তিনি ধূমপান করিলেন। তাঁহার আফিম অত তীব্র নহে। ধূম পানের সময় শুইতে হয় না। এক ছিলিমে একবার মাত্র টানা যায়। পাতলা ধোঁয়া হইতে মধুর গোলাপী গন্ধ ছুটে, অমন মেঘের মত অন্ধকার হয় না। ধূমপান শেষ হইলে আবার গল্প ও মিষ্ট হাসি আরম্ভ হইল। কথা বলিতে বা হাসিতে উচ্চ শব্দ নাই। সকল দেশের ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিদের যেমন একটু স্বভাবতঃই আদব-কায়দা দুরস্ত থাকে, তাঁহাদেরও সেইরূপ দেখিলাম। দিনে গুরুতর পরিশ্রমের পর স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-পুলে একত্র

বসিয়া আরাম ও গল্প-গুজব করা দেখে, আমার নিজেদের দেশের কথা, মনে হ'তে লাগল। এরূপ বিশ্রামে কত আনন্দ,—কত শান্তি আমাদের ঘরে তাহা নাই।

বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে "পিজন ইংলিসে" তাঁহাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া অল্পক্ষণে কত বিষয় শিখিলাম! প্রথমেই তাঁহাদের দেশে বিবাহ-প্রথার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দেশে সকলেই বিবাহ করে,—এমন লোক নাই যে, বিবাহ করে না। পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার ও নিজেদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পুত্র-সন্তান একান্ত প্রার্থনীয়। শবদেহ সমাধিস্থ না হইলে তাহার আত্মা অস্থির হইয়া যন্ত্রণায় চারিদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কি আশ্চর্য্য! আমাদের দেশেও কতকটা এইরূপ বিশ্বাস ও এইরূপ প্রথা। প্রাচীনদেশ মাত্রই পরস্পরে কত মিল দেখা যায়। পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়সে প্রায়ই বিবাহ হইয়া যায়—কিন্তু স্ত্রীলোকের অতি শৈশবেই বিবাহ হইতে পারে। সচরাচর কিন্তু বয়স্থা হইলে, ১৮।২০ বৎসরেই বিবাহ হয়। বিবাহে বরের তরফ হইতে কন্যার পিতাকে পণস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হয়। কন্যার বয়স যত অধিক, পণও তত বেশী। সেই কারণে অনেকে অল্প পণ দিয়া চার বৎসরের বালিকাও বিবাহ করে। চীনের বিবাহ-প্রথা অতি চমৎকার। পাত্র ও পাত্রীতে পূর্ব্বে দেখা হইবার নিয়ম নাই। গণকের পরামর্শ অনুসারে শুভদিনে, শুভক্ষণে বিবাহের দিন ঠিক হয়। পরস্পরের কোষ্ঠি মিলাইবার পর তবে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু বিবাহ ঠিক হইবার পর যদি গৃহে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে বা কোনও জিনিষ চুরি যায় বা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ফল শুভজনক হইবে না, এই আশঙ্কায় বিবাহও ভাঙ্গিয়া যায়।

বিবাহের দিন বরকে পাত্রীর বাড়ী যাইতে হয় না, লোক জন ও যান-বাহন পাঠাইয়া পাত্রীকে পাত্রের বাড়ীতে আনা হয়। বরের পিতা মাতারই কথামত বিবাহ হইয়া থাকে, পাত্রের তাহাতে পছন্দ

অ-পছন্দ নাই। শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ক'নে দরজার নিকট রক্ষিত কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর সেই বাড়ীর সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহাকে "বরণ" করিয়া গৃহে লইয়া যায়। অশুভদর্শী বিধবাদের সে সময়ে সামনে দাঁড়াইতে নাই।

অনন্তর পাত্রের সঙ্গে ক'নের "শুভদৃষ্টি" হয়। পরে পাত্রী বরের চারিধারে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে উভয়ে এক আসনে বসে, —এবং বসিবার সময় পরস্পর পরস্পরের কাপড়ের উপর বসিবার চেষ্টা করে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যে যাহার কাপড়ের উপর বসিতে পারিবে, সেই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবল হইবে।

পুত্র-সন্তান প্রসব না করিলে স্ত্রীর আদর নাই। তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারে! বহু-বিবাহ চীন দেশে নিষিদ্ধ। একজন লোক, এক সময়, একটী মাত্র বিবাহ করিতে পারে। তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর একটী বিবাহ করা চলে, কিন্তু একটি থাকিতে চলে না।

চীনদেশে সৌন্দর্য্যের বিচার পা দেখিয়া হয়। যার পা যত ছোট, সে তত সুন্দরী। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ের কেমন রঙ, কেমন গড়ন, কেমন মুখশ্রী, সে সব প্রশ্ন উঠে না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তার পা কত বড়?" পা তিন ইঞ্চি হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী হয়। সেই কারণ, শিশুকাল হইতেই পায়ের আঙ্গুলকটি মুমড়াইয়া দিয়া পায়ে জুতা পরাইয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িতে না পারে। ইহাতে শিশুর যন্ত্রণার একশেষ হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে

পা ছোট করিবার পাদুকা-যন্ত্র।

অধীর হইয়া তাহারা অহরহ কাঁদে। কখনও কখনও আঙ্গুলগুলি পচিয়া খসিয়া পড়ে। পা এত ছোট করে বলিয়া চীনে স্ত্রীলোকেরা ভাল করিয়া চলিতে পারে না।

চীনদেশে স্ত্রীলোকদিগকে আত্মহত্যা করিতে প্রায়ই শুনা যায়। শাশুড়ীর অত্যাচারই তাহার একটি প্রধান কারণ। শাশুড়ীর কথায় তাহাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে। দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের উপর অল্প-বিস্তর অত্যাচার পৃথিবীর সকল প্রাচীন দেশেই প্রচলিত ছিল। এখনও এসিয়ার অনেক দেশে রহিয়াছে। সেই অত্যাচারের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা অনেকস্থলেই সামাজিক ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। পাশ্চাত্য সমাজের এই একটি বিশেষ গুণ—স্ত্রীজাতির এই হীন, কষ্টকর অবস্থা হইতে কতক পরিমাণে মুক্তিদান। আরমিনিয়া প্রভৃতি এসিয়ার কোন কোন স্থানে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়াছে।

বিধবা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। তবে দরিদ্রলোকের ঘরে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। যদিও বিধবা-বিবাহ-প্রথা নাই বটে, কিন্তু উপপত্নী ভাবে অন্যের সঙ্গে থাকিবার নিয়ম আছে। তাহাদের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা হেয় হইলেও আইনানুসারে একেবারে নিরাশ্রয় নহে। তাহারাও মাতার উপপতির বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পায়। আবার এদিকে সহমরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। সহমৃতা স্ত্রীলোকের গুণের কথা আর লোকের মুখে ধরে না। আমাদের দেশে যেমন জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ পূর্ব্বক সহমরণ হইত, এখানে সেরূপ হয় না। জনসাধারণের সম্মুখে একটী স্থানে দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহা দ্বারা গলায় দড়ি দিয়া মরা বা মারা হয়; আর সেই স্থানে পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ চীন রাজ্যের সরকারী খরচে একটী প্রস্তরস্তূপ নির্ম্মিত হয়।

যখন এই সকল কথা শুনিতেছিলাম, তখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। নিজেদের দেশের পুরাকালের কথা ভুলে গিয়ে আমি তাহাদিগকে বর্ব্বর জাতি ব'লে মনে করিতেছিলাম। সেই চীনদেশীয় ভদ্রলোক তাঁহার আলবাম (ছবির খাতা) খুলিয়া দু'এক খানি সহমৃতার প্রস্তর-স্তূপের ছবি আমাকে দেখাইলেন। এখানে তাহার নকল ছাপাইলাম।

সহমৃতার স্মৃতি-স্তম্ভ

এখন যদিও আইন অনুসারে এ সকল প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তবু মাঝে মাঝে সহমরণ এখনও ঘটিতে দেখা যায়। সুধু তাই নয়। আজও চীনদেশে কন্যাসন্তানকে মারিয়া ফেলিতে শুনা যায়। পূর্ব্বে সচরাচরই এরূপ ঘটিত। কন্যা যদি কুল হিসাবে উপযুক্ত পাত্রে না পড়ে বা দুঃশীলা হয়, পিতার তাহাতে মাথা হেঁট ও বংশমর্য্যাদার হানি হয়। পাছে

এইরূপ ঘটে, এই আশঙ্কায় কন্যাসন্তান জন্মিলেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করা হয়। পিতামাতার সন্তানের উপর অসীম ক্ষমতা। জীবননাশ ও দানবিক্রয় সকলই করিতে পারেন। কোন কোন সহরের বাহিরে প্রকাণ্ড পুকুর দেখা যায়। তাহার জলে শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে ডুবাইয়া মারা হইত। আমাদের দেশেও অমন শিশুহত্যা (Infanticide) সেদিন অবধি প্রচলিত ছিল। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক শিশুহত্যা ও সতীদাহ এককালে রোধ করেন। ধর্ম্মের নামে কতই কদাচার সামাজিক আচার-ব্যবহারে ঠাঁই পায়। কতই স্বার্থপর জঘন্য প্রথা এইরূপে ধর্ম্ম নামের চিরপবিত্রতা নষ্ট করে।

হংকং ইংরাজরাজত্ব। এখানে ওসকল প্রথার লেশমাত্র নাই। এময় প্রভৃতি চীন-সম্রাটের রাজত্ব। তথায় এখনও কন্যা-হত্যা, সহমরণ, শিশুবিক্রয় ও লঘুপাপে অতি গুরুদণ্ড হইয়া থাকে। সন্তানের উপর পিতামাতার অসীম ক্ষমতা,—তাহাদের প্রাণবিনাশ ও তাহাদিগকে বিক্রয় প্রভৃতি তাঁহারাই করিতে পারেন। রাজ্যের রাজারও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই। দরিদ্র লোকেরা অনেক সময়ে বাজারে ছেলে-মেয়ে বিক্রয় করিতে আসে। আমি এ সকল স্বচক্ষে দেখি নাই। তবে ছেলে বিক্রয়ের যথার্থ ফটোগ্রাফ এময় সহরে দেখিয়াছি।

আমাদের এই সকল কথা হইতেছিল, এমন সময়ে পাশের ঘরে একটী কচি ছেলের কান্না শুনা গেল। গৃহিণী এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে অতি আগ্রহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কান্না শুনিবামাত্র তিনি তখনি ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটিলেন, ও অল্পক্ষণ পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত, মাথায় পাতলা লাল ফিতা বাঁধা একটী ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু কোলে ক'রে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

আমি ছোট ছেলে বড় ভালবাসি। সেই ছেলেটিকে কোলে লইবার

জন্য হাত পাতিলাম। এক মুখ হাসিয়া খোকার মা আমার কোলে ছেলেটিকে দিলেন। কে জানে কেন ছেলেটিও ঝাঁপিয়ে আমার কোলে এলো। আমি অপরিচিত আমার দাড়ি আছে, সে কখনও তাদের দেশে দাড়ি দেখে নাই, তবুও যে কেন অমন ক'রে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে এলো বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় যারা ছেলে ভাল বাসে শিশুরা তা বুঝিতে পারে।

আমি তাকে কোলে নিয়েই জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাদের দেশে নাকি বাছা, ছেলে বেচে—মেয়ে মেরে ফেলে?" শিশু কিছু না ব'লে আমার দাড়ি ধরে টানলে। আমি তাকে কোলে ক'রে দোলাতে লাগিলাম। তার ননীর মত হাত দুটি ধ'রে আদর ক'রতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে তার নরম গাল দুটি টিপিবামাত্র শিশুর মুখে হাসি ফুটিল। এতক্ষণ ইংরাজীতে কথা ব'লছিলাম, অমনি সে ভাষা একেবারে ভুলে গিয়ে নিজের ভাষায় ছেলে আদর করার একটি শ্লোক আমার মনে এলো ইচ্ছা হলো সেই শ্লোকটি চেঁচিয়ে ব'লে খোকাকে চুমু খেতে খেতে আদর করি,—

"সরল মুখে মধুর হাসি আকুল করে মন।
প্রাণ ভুলান এমন হাসি কোথায় পেলি ধন?"

তার মুখে পদ্ম ফুলের মত সুগন্ধ। মুখের কাছে নাক নিয়ে গিয়ে লাল ঠোঁটে ঠেকিবামাত্রই, স্তনাগ্র মনে ক'রে, শিশু আমার নাকের ডগ চক্‌চক্ ক'রে চুষতে লাগল। তাতে আমার সমস্ত শরীরে এমন একটা মধুর ভাব এলো যে, ইচ্ছা সত্বেও যেন আমি আর নাক সরিয়ে নিতে পারিলাম না আপনা আপনি চোখ বুজে আসতে লাগল। খোকারা যখন মাই খায় তখন তাদের মা'দের বুঝি এমনি মধুর আবেশ হয়। খোকার মা আমার আনন্দ দেখে মধুর কণ্ঠে, উচ্চ হাসি হেসেই আকুল।

ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝিয়া আমি শিশুটীকে মার কোলে দিলাম, মনে করিলাম, তিনি হয়ত মাই দিবেন। তিনি কিন্তু মাই দিলেন না। এক দাসীকে দুধ আনিতে বলিলেন। শুনিলাম, উহা গরুর বা আর কোন পশুর দুধ নয়, স্ত্রীলোকেরই স্তনের দুধ গেলে ঈষৎ গরম ক'রে, ছোট হাল্‌কা লাল নীল দাগ কাটা কাঁচকড়ার বাটীতে সেই দুধ নিয়ে এল। দুধ খাওয়ার ঝিনুকটী যেন এক রকমের,—না ঝিনুক, না চাম্‌চে। তাই দিয়ে পাছে দুধ প'ড়ে জামা ভিজে যায় বলে, ছেলের গলায় শাদা রুমাল বেঁধে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। দুধ খাওয়াবার সময় ঠিক আমাদের দেশের ছেলের মত ছেলেটী পা ছুড়ে কাঁদতে লাগল। ছেলের কান্না ও দুধের বাটির শব্দ শুনে কোথা থেকে একটী পাটকিলে রঙের ঝাক্‌ড়া লোমওয়ালা মোটা সোটা চীনে বিড়াল নিমিষের মধ্যে তথায় এসে জুটলো! ছেলে ভুলাবার জন্য মা কত কি চীনে বুলি সুর ক'রে বল্‌তে লা'গলেন! বোধ হয় ব'লছিলেন,— "আয় পুসী আয়,—খোকন দুধ খাবেন। আয়! খোকন খাবেন তোরাও খাবি!" বিড়ালটীও সামনে বসে কৃতজ্ঞভাবে অনুচ্চ মধুর স্বরে যেন গৃহস্থদের শুভ কামনা ক'রে বল্‌ছিল,—"মা, তুই সুখে থাক্‌, তোদের ভাত-জল খেয়েই আমরা সাত পুরুষে মানুষ হয়েছি। তুই না দিলে কে দেবে।" পরে যত খাওয়া শেষ হ'য়ে যেতে লাগলো তত আরও আগ্রহে সে ঘাড় তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ব'লতে লাগল,— "দেখিস্‌ মা অন্যমনস্ক হ'য়ে খাওয়াতে খাওয়াতে আমার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে যেন সব দুধটুকু খাইয়ে ফেলিস না। তোর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্‌, নাতিপুতি নিয়ে, পাকাচুলে সিঁদুর প'রে সুখে-সোয়াস্তিতে ঘরকন্না কর্‌!"

এময়।

[প্রথম প্রস্তাব।

হংকং বন্দর হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে অতি সুন্দর। কাউলন নামক যে স্থানের কথা আগে বলিয়াছি, সে স্থান এই পথেই অবস্থিত। সেটী সেনা-উপনিবেশ ও রসদাদি সংগ্রহ করিবার একটী প্রধান আড্ডা। অতি সুদৃঢ় কেল্লা দ্বারা রক্ষিত। যতদূর দেখা যায় কেবল কারখানা, যুদ্ধের জাহাজ, আর ধ্বজা-পতাকা উড়ান প্রাচীর-বেষ্টিত কেল্লা। সেখানকার পাহাড়গুলিও তেমনি দেখিতে। কালো কালো অতি প্রকাণ্ড পাতরের স্তূপ; মাটী নাই—গাছ পালাও নাই। দেখলে যেন ভয় করে। ভীমবেগে সাগরতরঙ্গগুলি তাহাদের গাত্রে লাগিয়া ফেনীল হইয়া যাইতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া সে বিষম জল-কল্লোল কতই বা ভয়ানক শুনায়! মনে হয়, যেন সমুদ্রে আর বেলা-ভূমিতে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে দুটী পাহাড়ের মধ্যে বাহির হইবার পথ কেবল মাত্র কলিকাতার গঙ্গার মত চওড়া। ওরূপ স্থলে, ওরূপ সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত স্থানের নিকট শত্রুর জাহাজ আসা একেবারে অসম্ভব। ভূমধ্য সাগর প্রভৃতি অন্যান্য সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহা-সাগরের উপরও আধিপত্য স্থাপনাশায় এ স্থানটী এমন সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হংকং হইতে এময় যাইতে সচরাচর একদিন লাগে। কিন্তু আমরা পাঁচ দিনে তথায় পৌছিলাম। চীন সমুদ্রের অবস্থা এতই ভয়ানক ছিল যে, যে জাহাজ ঘণ্টায় পনর মাইল চলে, তাহা দুই মাইল মাত্র

চলিতে লাগিল। , সামনের দিক হইতে অতি প্রবল হাওয়া ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজের গতিরোধ করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে অনেক কথা "চীন সমুদ্র" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

পাঁচদিন পরে যখন এময়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, এইবার ইংরাজ অধিকার ছাড়িয়া খাস চীন-রাজত্বে আসিয়াছি। তীরভূমি কালো কালো পাতরের পাহাড়ে আচ্ছন্ন। সমুদ্রেও সেইরূপ পাতরের দ্বীপ চতুর্দ্দিকেই দেখা যাইতেছিল। কোন কোনটার উপর ছোট ছোট চীনে কেল্লা নির্ম্মিত। তথায় গাছ পালা নাই। মাটি নাই, সুতরাং গাছ পালা কোথা হইতে জন্মিবে? কেবলই পাতর।

আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দূর থেকে দেখা যাইতে লাগিল,—পাহাড়ের পাতরগুলি স্তরে স্তরে কাটা। তার উপর মাটী বিছাইয়া শস্য বুনা হইয়াছে। সেইগুলিই এ সকল স্থানের শস্যক্ষেত্র। পরে শুনিলাম, ৫০০ শত কি ৬০০ শত ফুট নীচে হইতে জল আনিয়া তাহাই সেচন করিয়া, তবে এই সকল ক্ষেত্রে শস্য জন্মান হয়। কত রকম দেশী সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করে। কৃষককে বৎসরের আট মাস পর্য্যন্ত ১৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেতে উদ্ধ-সংখ্যা দুইটী ফসল পাওয়া যায়। লোক-সংখ্যা এত অধিক ও এমন স্থানাভাব যে, এইরূপ জমিতে চাষ না করিলে, চাষ করিবার আর জমি নাই। সেখানকার কষ্টকর কৃষকজীবনের এই সকল কাহিনী শুনিয়া আমার ভারতবর্ষের কথা মনে হইতে লাগিল। সোনার সমতল ভারত-ক্ষেত্রে কত নদী, জমির কত উর্ব্বরতা! এ দেশে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে কেন? চীন দেশের লোকের মত উদ্যোগী ও বুদ্ধিজীবী হইলে এমন দেশে কখনও অজন্মা ও অকাল হয় না।

চীন দেশে যে চাউল জন্মে, তাহা বড় ভাল নয়, বড় বেশীও নয় ও তাহার বড় আদরও নাই। তাহা দেখিতে লম্বা লম্বা। ব্রহ্মদেশ

হইতেই চাউল রপ্তানি হইয়া এ সকল স্থানের লোকের খাদ্য জোগায়। খাদ্যের জন্য চীনরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে চাল আমদানী হইয়া দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন সহরের প্রকাণ্ড চীন খাল দিয়া পিকিঙে আসিত,—আজকাল জাহাজে আসে; আর আফিম আসে ভারতবর্ষ হইতে। মোটামুটী বলিতে গেলে, চা-ই কেবল এ সকল ক্ষেত্রে চাষ করা হয়। কেহ কেহ কিন্তু লুকাইয়া আফিমেরও চাষ করে। তাহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া, জমিদারগণ তাহাতে আপত্তি করেন।

চীন দেশের চা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইখানেই চার প্রথম উৎপত্তি এবং এখনও এখান হইতে রাশি রাশি চা রপ্তানি হইয়া দেশ দেশান্তরে যায়। ইয়াঙ-সি-কায়াঙ নদীর সমুদ্র-মোহানা হইতে দেড় হাজার মাইল উপরে হানকাউ নামক স্থানটী উত্তর চীনের যত চা রপ্তানির আড়ং; জাপান ও রুষের হাতেই সে সকল চা বেশী পড়ে; আর দক্ষিণ চীনের চার আড়ং ক্যান্টন। ইংরাজ বাহাদুরেরা এখানকার চা হস্তগত করেন। ভারতবর্ষে যে চীনের চা আমদানি হয়, সে সবই এখান হইতে রপ্তানি হয়। তবে আজকাল ভারতবর্ষ ও সিংহলে অতি উপাদেয় চা জন্মে বলিয়া চীনের চার আমদানি অনেক কমিয়া গিয়াছে।

চীনদেশের চার একটী বড় সুন্দর সুগন্ধ আছে। এইরূপ সৌরভ অন্য কোথাকার চা'তে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চীনেরা বড়ই চা ব্যবহার করে। দিনের মধ্যে কতবার যে তাহারা চা পান করে, তার ঠিক নাই। কাহারও বাড়ী যাইলেই সর্ব্বাগ্রে চা দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। তবে সে চা ছোট ছোট পেয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। এক একটী পেয়ালায় আধ ছটাক মাত্র ধরে। আমরা এদেশে যে সকল পেয়ালা ব্যবহার করি, ইহার মাপ তাহার তিন চারিগুণ। চীনেরা

চায়ে দুধ বা চিনি মিশায় না। তাহারা সবুজে চা বড় ভালবাসে। তাহার গন্ধও অতি সুন্দর ও উহা বড়ই উত্তেজক। অনেকে আবার চায়ের সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খায়। ঐরূপ চা এক চুমুক খেয়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল!

এময়ের বন্দরে ঢুকিবার পথে আমাদের অনেক দেরি হইল। এ সকল স্থান ত আর ইংরাজ-রাজত্ব নহে,—সমিহ করিয়া ঢুকিতে হয়। তখন জাহাজের মাস্তলে "ড্রাগন" আঁকা চীনে নিশান উড়ান হয়। বন্দরের বাহিরে নঙর করিয়া জাহাজ পাইলটের জন্য ঘন ঘন সিটী দিতে লাগিল। এখানে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা দেরি হইল। এমন দেরি কোথায়ও কখন হয় নাই।

ঢুকিবার পথেই দেখিলাম, অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ ও ক্রুজার জাতীয় জাহাজ নঙর করিয়া রহিয়াছে। তার মধ্যে মার্কিণ ও ফরাসী জাতির জাহাজই বেশী। সবগুলি সুসজ্জিত, সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কাহারও বা চারিটী মাস্তল, কাহারও বা তিনটী, কাহারও বা দুইটী। স্তরে স্তরে সারি সারি ঘুলঘুলি সাজান; তাহার ভিতর দিয়া কামানের মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে। মাস্তলের উপরে উপরে লোহার মাচা বাঁধা; সেখান হইতে বন্দুক ছুড়ে। এইরূপ কুটিল স্থান হইতে গুলি আসিয়া ট্রাফালগার যুদ্ধে বীরবর নেল্‌সনের বুকে লাগিয়াছিল। সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চত্ব পান; কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে জয়ঘোষণা শুনিয়া গিয়াছিলেন। রেলিংএর চারি ধার হইতে কালো কালো ঢলঢ'লে পোষক-পরা গোরা নৌসেনাগুলি আমাদের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কে জানে কেন?

এখানে বন্দরের এক নূতন রকম ব্যবস্থা; এক ধারে ভিন্ন দেশীয় জাহাজ থাকিবে, আর এক ধারে চীনে জাহাজ থাকিবে। চীন এলাকায় প্রথম আসিয়া নঙর করিবার সময়কার দৃশ্যটী এখনও আমার

মনে সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া আছে। সমুদ্রবক্ষ নৌকায় আচ্ছন্ন। শত শত সাম্‌পান ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মেয়ে পুরুষের উত্তেজনাপূর্ণ গলার শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

চীনেম্যানরা এদেশে স্বাধীন। ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ এখানে চীনের প্রজা। বিদেশীয় রাজপ্রতিনিধিদের (কন্সল্) বসতির জন্য দূরে একটী দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেখানকার রাজপ্রতিনিধিবর্গের প্রাসাদ হইতে ভিন্ন দেশের ভিন্ন রকম পতাকা উড়িতেছে। প্রথমেই আমেরিকার আড্ডা। তার পরেই জাপানের (Rising Sun) "উদীয়মান" সূর্য্যের লাল ছবিযুক্ত নিশান সদর্পে উড়িতেছে। যেন সবে মাত্র অতল জল হইতে উঠিয়াছে; অনন্ত আকাশে এখনও যে কত উঠিবে তার ইয়ত্তা নাই। তার পর ইংরাজ দূতনিবাস। সে বাড়ীটী দেখিতে বেশ উচ্চ, পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠিত; কিন্তু ওসকল স্থানে উহার ধ্বজার যেন তত বাহার নাই, তত দর্পও নাই। তার পাশেই ফরাসী ও জার্ম্মান দূতাবাস, তিন রঙের ডোরা কাটা ধ্বজা পতাকা। দ্বীপটী পাহাড়ময়, সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলিও পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। দ্বীপ বলিয়া অনেকটা নিরাপদ; আর সভ্য জাতির আড্ডাস্থান বলিয়া পরিপাটীরূপে সাজান। দেখিতে যেন ছবির মত সুন্দর। তার ভিতরে গিয়া দেখিবার পর আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই তথায় আছে; বেড়াইবার বাগান, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, উপাসনার ধর্ম্ম-মন্দির, গোরস্থান, লাইব্রেরী, হোটেল, থিয়েটার,—সুসভ্য জাতির আবশ্যকীয় সবই বর্ত্তমান। সমস্ত দ্বীপটী যেন একটী বাগান; এমনি সুসজ্জিত, এমনি পরিপাটী। সকল জাতিই বিদেশে নিরাপদের জন্য পরস্পরে মিলে মিশে একত্র হইয়া বাস করিতেছে।

অপর দিকে,—দূরে চীন-এময়। সেখানকার সব বড় বড় পাতর-নির্ম্মিত বাড়ী। কতকগুলি ইউরোপীয় ধরণে গঠিত; কতকগুলি বা

চীনে প্রণালীতে গড়া। ঢালু ছাতওয়ালা বাজার। গৃহস্থদের ছোট বাড়ীগুলির খিড়কীতেই সমুদ্র,—ছোট ছোট ধাপ দিয়া তাদের বাড়ীতে উঠা যায়। যেখানে সেখানে "ড্রাগন" আঁকা চীন দেশের নিশান উড়িতেছে। আর অতি দূরে,—সহরের একদিকে একটা উচ্চ পাহাড়,—তার গায়ে গায়ে শ্বেত পাতরের স্তূপ। সেগুলি যে কি, দূর হইতে তাহা দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল না। পরে যখন সেই পাহাড়টীতে উঠিয়াছিলাম, তখন জানিলাম সেগুলি চীনেদের গোরস্থান। আর সেই পাহাড়েরই অত্যুচ্চ চূড়ায় এক প্রকার পাতরে অতি প্রাচীনকালের চীনে ভাষায় লিখিত প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। এই প্রাচীন স্থানটিতে চীনেদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত শতাব্দি ধরিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত; এইজন্য এ স্থানটি পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

বন্দরটী নৌকা ও জাহাজে পরিপূর্ণ। বন্দরে ঢুকিবামাত্রই পোষ্টাফিস হইতে, কষ্টম হাউস হইতে, পুলিস হইতে, ভিন্ন ভিন্ন সওদাগরদের আফিস হইতে ষ্টীমার ও সাম্পান আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিল। তার ভিতর অনেকগুলিতেই ইউরোপীয় কর্ম্মচারী, তাঁরা সকলেই ইংরাজী জানেন। নৌ-পুলিসের জাহাজখানি আসিয়া, যতক্ষণ লোক জন নামা-উঠা করিতে লাগিল, ততক্ষণ পাছে লোক জনদের কোনও-রূপ বিপদ-আপদ ঘটে, এই আশঙ্কায়, আমাদের জাহাজের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাত্রি আগত হইলে এই চীন বন্দরে একটি দৃশ্য দেখিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুন্দর বেশভূষা করিয়া চীন দেশীয় গণিকা-গণ সাম্পানে, দলে দলে জাহাজে আসিয়া উঠিতে লাগিল। যাত্রীর ভাণ করিয়া নহে, কোন কিছু বেচিবার অছিলা করিয়াও নহে, প্রকাশ্য ভাবে—শীকার উদ্দেশে তাহারা জাহাজে আসে ও তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হয়। শুনিলাম পূর্ব্বে জাপান দেশের ইয়াকোহামা

প্রভৃতি বন্দরেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আইন পাস করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। অতিশয় পেটের জ্বালায় তাহারা ওরূপ করে। আর পারিতোষিকের মূল্য এত কম যে, বোধ হয়, তাদের অতি দারুণ অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু যে চির গাম্ভীর্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা ইহাদের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ আছে।

এময়-বন্দর।

আর দেখিলাম, যে সকল লোক তাহাদের সহিত পরিচয় করিল, তাহারাই আবার পরক্ষণে তাহাদের ঘৃণা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পাষণ্ডরা তখন ভুলে গেল যে তাহারা নিজেও সমান অংশে দোষী। সে সময়ে আমাদের দেশের কর্ম্মবীর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কথা মনে হ'তে লাগিল। রমণীগণকে ওরূপ বিপন্ন দেখ্‌লে তাঁহার মনে কত কষ্ট হতো। ভাতের থালা সাম্‌নে দিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের অনশন-ক্লিষ্ট প্রজাদের কথা ভাবিয়া তাঁর চোখে জল আসিত।

এময়।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

সকল দেশেই চীনেম্যান দেখা যায়, কিন্তু সকল দেশের লোকেই তাহাদিগকে এক রকম অদ্ভুত লোক বলিয়া মনে করে। দেখিতে এক রকম, পোষাক এক রকম, মেয়ে মানুষ নয়, অথচ পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত বেণী। ইহারা কাহারও সহিত মিশতে জানে না। মুখে হাসি নাই, সদাই গম্ভীর এবং যাহা পৃথিবীর সকল লোকের হেয় এমন সব খাদ্য খায়। এই সকলই অদ্ভুত মনে করিবার কারণ। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা তো চীনেম্যানের নাম শুনিলেই "হং-ছং-পং" ক'রে ভেঙ্গায়! চীনেম্যান সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, 'জুজুবুড়ীর' গল্প শুনার মত সভয়ে অতি আগ্রহের সহিত চুপ করিয়া শুনে। আমি দিনকতক মাত্র জাহাজে বেড়াতে গিয়ে চীন দেশ দেখে এসেছি, তাতেই কত নাম। ব্রহ্ম ও মালয় দেশ দিয়াও গেলাম, তার নাম কেউ করে না, কিন্তু চীন দেশে কি দেখিলাম সেই খবরই সবাই শুনতে চায়। এই সকল হইতে বুঝা যায়, চীনজাতি ও চীনদেশকে লোকে যথার্থই অদ্ভুত বলিয়া মনে করে।

বাস্তবিকই তাহারা অদ্ভুত। বহুদিনকার পুরান এক রকম রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে আজও চলিতেছে। বাহির হইতে ইহারা কোনও পরিবর্ত্তন লইতে চাহে না। অত প্রাচীন বা অতবড় বিশাল রাজ্য আর নাই। আর এতাবৎকালের চীনের ইতিহাসও অতি বিস্ময়কর।

সকল দেশেরই পুরাতন ইতিহাস অনেকাংশই অজ্ঞাত। সেই

অজানা অংশটুকু প্রায়ই দৈবী ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া বুঝান হয়। চীনদেশের ইতিহাসের প্রারম্ভেও সেইরূপ দৈবোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাকালে পৃথিবী ও আকাশ একত্র ছিল। তাহারা পৃথক হওয়ার পর দেববংশই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাই চীনেম্যানরা আপনাদিগকে "স্বর্গীয়" বলে। তারপর নরবংশের আবির্ভাব। এই তো গেল চীনে মতে চীনরাজ্যের উৎপত্তির বিবরণ।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রথম চীনজাতি কশ্যপ হ্রদের দক্ষিণ তীর হইতে চীনদেশে প্রবেশ করে। বেবিলেন দেশীয় লোকদের সহিত তাহাদের যে নিকট সম্পর্ক ছিল, তাহা তাহাদের জ্যোতিষ ও ভাষাদি অনেক বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ক্রমে ক্রমে তাহারা আদিমবাসীদের জয় করিয়া দেশ অধিকার করে। সে সময়ে অনেক ছোট ছোট রাজার অধিকারে দেশটী বিভক্ত হইয়া ছিল। তাহারা প্রায়ই পরস্পরের সহিত কলহ করিত। পরে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রতাপান্বিত "সিন্" বংশীয় রাজাদের সময় চীনদেশের অধিকাংশই এক রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এই সময়েই উত্তর তাতার জাতীয় শত্রুদের আক্রমণ হইতে রাজ্য বাঁচাইবার জন্য চীনদেশের বিস্তীর্ণ প্রাচীর গাঁথা হয়। তাহা আজও অবধি পৃথিবীর অতি বিস্ময়কর পদার্থের মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য।

প্রাচীর তুলিয়াও তাতারের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারাতে, তাহারা মোগলদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মোগলরা আসিয়া তাতারদের দমন করিল বটে, কিন্তু নিজেরাই দেশ অধিকার করিয়া বসিল। পরে "মিঙ্" বিদ্রোহের সময় মোগলদের তাড়াইয়া দিয়া চীনেরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। কিছু বৎসর পরে একজন বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য তাতারদের আহ্বান করা হয়।

তাতারগণ আসিয়া বিদ্রোহী দমন করিয়া নিজেরাই পিকিঙে রাজা হইয়া বসে।

সেই অবধি মাঞ্চু-তাতারগণই চীন দেশের অধীশ্বর। রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য যত বড় পদ, সব তাহাদেরই করায়ত্ত। সকল বড় বড় সহরে তাহাদের থাকিবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ চীনে লোক সেখানে থাকিতে পায় না। আমাদের যেমন কলিকাতার ভিতর সাহেবদের জন্য থাকিবার স্থান চৌরঙ্গী, সেখানেও রাজবংশীয় তাতারদের থাকিবার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে আমরা ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গী গিয়াও থাকিতে পারি, চীনেরা সে সব স্থানে তা পারে না। এক পিকিঙেই একটির ভিতর একটি—এইরূপ চারিটা গণ্ডী আছে, তার সর্ব্ব বাহিরের গণ্ডীটা ব্যবসায়ীর আড্ডা (Commercial or Chinese City); এই খানেই সাধারণ চীনে লোক বাস করিতে পারে। তাহার মধ্যে তাতার সহর (Tartar City); সেখানে কেবল রাজজাতি তাতার বংশীয় লোকেরা থাকেন। তার মধ্যে রাজকীয় সহর (Imperial City); সেখানেই রাজসভা ও সরকারী আফিস; তাতার বংশীয় রাজকর্ম্মচারীদের বাস। তার মধ্যে আবার নিষিদ্ধ সহর (Forbidden City); সেখানে কেবল রাজপ্রাসাদ, অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। চীনদেশে বিজেতা ও বিজিতের এই প্রভেদ বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমাদের ভারতবর্ষে প্রকারান্তরে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে কতকটা ঐরূপ প্রভেদ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া আছে। ইংরাজ রাজত্বে রাজার জাতি প্রজার জাতিতে যে প্রভেদ, এর সঙ্গে তুলনায় তাহা কত অকিঞ্চিৎকর কত নগণ্য।

এই গেল চীন রাজ্যের পুরান ইতিহাস। চীনদেশের আধুনিক ইতিহাস বৃদ্ধা মহিষীকে লইয়াই (Dowager Empress) আরম্ভ

হইয়াছে বলিতে হইবে। এই চতুরা স্ত্রীলোকের হাতে চীন-সম্রাট আজ ৪০ বৎসর ধরিয়া বন্দী আছেন। তাঁহার কূট চরিত্র, জীবনের ইতিহাস ও কার্য্যাবলী এক বিচিত্র কথা। সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলিতেছি।

এই স্ত্রীলোকটির নাম "তেজদী"; ইনি চীন জাতীয় নহেন। মাঞ্চুজাতীয় কোনও উচ্চ কর্ম্মচারীর কন্যা, পিকিঙে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, ইঁহাকে রীতিমত লেখা-পড়া শিখান। চীন জাতীয় খুব অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোকের ভাগ্যে এরূপ সুবিধা ঘটিয়া থাকে। সেই বিদ্যাশিক্ষার ফলেই আজ তিনি অত বড় বিশাল চীনরাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী।

১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চীন-সম্রাটের সহিত ইঁহার প্রথম দেখা হয়। তখন সম্রাট বিবাহিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চীনদেশে একটির বেশী বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। কাজেই ইঁহার রূপেগুণে অতিশয় মুগ্ধ হইলেও, সম্রাট ইঁহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া পাটরাণী করিতে পারিলেন না। তবে ইঁহাকে "অপরা পত্নী" বা ছোট রাণী ভাবে রাখিলেন। এরূপ রাখার একটি মাত্র অছিলা এই ঘটিল যে, প্রথমা মহিষীর গর্ভে তাঁহার কোনরূপ সন্তানাদি হয় নাই। অচিরেই তেজদী—এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া স্বামীর বড়ই প্রিয়পাত্রী হইলেন। তাঁহার চাতুর্য্যেরও অন্ত নাই। এই অবসরে চীনের বহুদিন-কার পুরাতন একটি প্রথা কোথা হইতে পুনরুত্থাপন করিয়া সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, চীনরাজের দারান্তর পরিগ্রহ চলে। রাজাও সেইরূপ বুঝিয়া যথাযথ ঘোষণা করিলেন। প্রথমা মহিষী যেমন পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন, তেজদীও তেমনি পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন। তেজদীর তাহাতে ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল।

কিছু দিন পরে চীনদেশে টেপিঙ-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। পাছে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজার সন্তান হয়, এই আশঙ্কায়, এই বিদ্রোহের

সুযোগে তেজদী বিষপ্রয়োগে রাজাকে সরাইলেন। লোকে বুঝিল, রাজ্যের গোলমালে রাজা ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন।

রাজার মৃত্যুর পর তেজদীর পুত্র চীনের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু তেজদী এবং প্রধানা মহিষী ও রাজভ্রাতা রাজকুমার তুয়ান, বালক রাজার "অছি" স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। রাজ্যশাসন অতি সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। বিদ্রোহ দমন হইল। কিন্তু সম্রাটের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার প্রয়াসী হইলেন। ইহাতে আবার গোলমাল বাধিল। নূতন সম্রাটও আপন মাতা তেজদীর হাতেই বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার সন্তান হইলে সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে; তাহার মাতারই তখন ক্ষমতা বাড়িবে; এই ভয়ে তেজদী তাঁহাকেও বিষপ্রয়োগে সরাইলেন।

অন্য কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় তেজদী নিজের ভ্রাতার একটি ছোট চার বছরের ছেলেকে সিংহাসনে বসাইলেন; ইহাতে তাঁহার নিজেরই ক্ষমতা বজায় রহিল।

কিন্তু বালক রাজার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানা মহিষীর সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য ও প্রণয় বাড়িয়া যাইতে লাগিল! তেজদীর ক্ষমতা হারাইবার ভয় হইল। অতঃপর তেজদীর বিষ প্রয়োগের ফলে সপত্নী প্রধানা মহিষীরও প্রাণ বিয়োগ ঘটিল।

চারিদিক শত্রু শূন্য করিয়া তেজদী মনে করিলেন যে, এইবার তিনি নিষ্কণ্টক হইয়াছেন, কিন্তু সম্রাট,—তেজদীকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোনও কথা শুনিয়া আর কাজ করেন না। কাজেই ইহাঁকেও সরাইবার আবশ্যক হইল। এই সময়ে চীন-জাপান-যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে চীন পরাস্ত হইয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফরমোজা দ্বীপসহ প্রায় শ'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ

জাপানকে দিতে হয়। এই সময়ে চীনের যার পর নাই বিপদ ঘটে। কিন্তু তেজদীর তাহাতে সুবিধাই হইল। তিনি চীন-সম্রাটের যাবতীয় বন্ধুবর্গকে সরাইয়া দিলেন। কাহাকেও নিপাত, কাহাকেও বা স্থানান্তরিত করিয়া, সম্রাটকে এরূপ নির্যাতন করিলেন যে, সম্রাট রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তার পর তেজদীর প্রিয় অন্য একটি রাজবংশীয় ছেলে এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বিধবা রাণী তেজদীই এখন সর্ব্বে সর্ব্বা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাঁর বয়স এখন ৮০ বৎসর - কিন্তু শারীরিক অবস্থা, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার স্পৃহা এবং বুদ্ধি-বৃত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ কখন কোথাও দেখিয়াছে, না শুনিয়াছে? ইনি এখনও রঙ্গিন রেশমের কাপড় পরেন, কানে মুকুতা ও গলায় হীরা-মতির হার ঝুলান! প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অঙ্গের মাংস লোল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু চোখের প্রখর ভাব এখনও যায় নাই। স্বামীহন্ত্রী, পুত্রঘাতিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, নরশোণিত-পিপাসু হইয়া ইনি চারিটী রাজা ও রাণীর প্রাণ হনন করিয়াছেন। তার মধ্যে দুইটী তাঁহার নিকটতম আত্মীয়,—একটী স্বামী ও একটী পুত্র। আর দুইটী রমণী,—তন্মধ্যে একটী গর্ভবতী। তা'ছাড়া কত নরনারী যে ইহাঁর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ইহাঁরই প্ররোচনায় চীনদেশের বক্সার অর্থাৎ মুষ্টি-যোদ্ধার গোলমাল ঘটিয়াছিল। তাহারা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম-যাজক ও চীনদেশীয় খৃষ্টানগণকে উৎপাত ও হত্যা করে, তখন ইনি তাহাদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পরে যখন পিকিঙের রাজপথে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ রাজদূতকে হত্যা করিয়া অপর সকল দূতদের সপরিবারে প্রাণনাশ করিবার জন্য বক্সারেরা দূত-নিবাস আক্রমণ করে, তখন ইনি তাহাদের

পেছনে ছিলেন। ইহাঁর অভিপ্রায় ছিল, সকল বিদেশী ও বিধর্ম্মীকে চীনদেশ হইতে চিরকালের জন্য তাড়াইবেন। ইহা অধিক দিনের কথা নহে। বিপন্ন দূতদিগের রক্ষার জন্য সকল রাজ্য হইতে সৈন্য গিয়া পড়িল।

সেই সময় হইতে চীন কতকটা দমিত হইয়াছে এবং অত্যাচারী-রাও অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন অবধি এময় প্রভৃতি আসল চীনদেশে বিদেশীকে বিপাকে পাইলে, তাহারা বিষম অত্যাচার করে। সন্ধ্যার পর আর সে সকল স্থানে থাকিবার যো নাই ; জাহাজে বা অন্য নিরাপদ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়।

এময়।

[তৃতীয় প্রস্তাব।]

যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তারমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আমার এময়ই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে, এময় খাস চীনদেশ। এখানকার রাজা চীন-সম্রাট; সব লোকই চীনে,—রীতিনীতিও সব একই রকম। বিদেশী লোক এখানে খুব কম এবং তাহাদের থাকিবার স্থানও অনেক দূরে,—একটী দ্বীপে।

সৌভাগ্য বশতঃ এখানে আমার একটী চীনে-বন্ধু মিলিয়াছিলেন। আমি যে রকম চাই, ইনিও ঠিক সেই রকমের লোক। ইনি চীনগামী অনেক জাহাজেরই এজেণ্ট। নাম স্থইচিন্; ধনবান্, সদানন্দ-চিত্ত, অতিথি-সৎকার পরায়ণ, যুবা পুরুষ। শুধু "পিজন্ ইংলিস্" নয়, বেশ ইংরাজীও ইনি জানেন এবং অনেক দেশও দেখিয়াছেন। ইনি কলিকাতায়ও একবার আসিয়াছিলেন। হিন্দু কাহাকে বলে, ভারতবর্ষ কোথায়, ইনি তা জানেন। এখানকার বিস্তর চীনেম্যান তা জানে না। সঙ্গে ক'রে আমাকে ইনি নানা স্থান দেখালেন, কত আচার-ব্যবহার ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এময়ের মত অজ চীনে সহরে আমার কিছুই দেখা-শুনা হইত না।

প্রথম দিনই এখানে একটী চীনদেশীয় বিবাহ-উৎসব দেখিলাম। সেটি: শুনিলাম বরের বাড়ি। পথটি যান-বাহনে এবং লোক-জনে পরিপূর্ণ, ও চীনে লণ্ঠন ও কাগজের ধ্বজা ঝুলান। বর-ক'নের বেশভূষা বড়ই মনোহর। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সবার সামনে চিরকালের জন্য সম্বন্ধ পাতাচ্চেন।

বর ক'নে।

এময় সহরের অদূরে একটী চীনে পল্লী আছে। একথা শুনিয়া আমার বড়ই লোভ হইল,—চীনে-পল্লী-চিত্র ভালরূপ দেখিব। সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখাইবার জন্য তাঁহাকে বলিবামাত্র তিনি রাজি হইলেন। এময় ও সেই পল্লীটির মধ্যে, সেই যে পাহাড়-টার উপর রকিং ষ্টোনে বহু পুরান চীনে প্রস্তর-স্তম্ভটী অবস্থিত. সেইটী পার হইয়া গ্রামে যাইতে হয়। কাঁধে বস্তা

যান পাইতে দেরি হইলে পাছে গ্রাম না দেখা হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার সহিত পদব্রজেই চলিলাম। যাইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তবে নূতন দেশে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাওয়ার আনন্দে পথশ্রম মনেই হইল না। সে পাহাড়টীর গায়ে ঘাস নাই। সাদা মাটীতে বাঁধান চীনদেশের গোরস্থান চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। নূতন পুরান অনেক গোর রহিয়াছে,—কোথাও কোনও মৃতের উদ্দেশে ফুল বা অন্য কোনও দ্রব্যের উপহার নাই। প্রতি দেহ প্রোথিত করিবার স্থানটি চারিদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অমুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

এইরূপ এক নূতন সমাধিস্থলের ভিতর দেখিলাম একটি রমণী বসিয়া আছেন। তাঁর সুন্দর পা'দুখানি পাদুকাহীন ও ঘন কালো চুলগুলি এলান। তাতে তাঁকে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। মঙ্গোলয়ন জাতি এলো-চুলের সৌন্দর্য্য বুঝে না। এক কাণে কুণ্ডল আছে, অপর কাণে নাই। বেশ মলিন। হাতে একটি পুঁটলী, তাতে দেখিলাম—একটি পুরুষের ব্যবহারের ছিন্ন টুপি বাঁধা। আমাদের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে একবার মাত্র চাহিয়া পুনরায় তাঁর নিজের অন্তরের কথা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁর বসিবার ভাব এমন যে দেখলে মনে হয়, এই নির্জ্জন সমাধিস্থলই তাঁর যেন বড় প্রিয় স্থান হইয়াছে। বোধ হয় কোনও অতি নিকট আত্মীয় চিরবিদায় লইয়া এই সমাধিতলে ঘুমাইতেছেন তাই তিনি ওস্থান ছাড়িতে চান না। দূর হ'তে তাঁকে দেখে প্রকৃতিস্থ ব'লে মনে হলো না। আর কল্পনার চখে অনেক কথা জেগে উ'ঠল। কিন্তু তাড়াতাড়ি ছিল বলিয়া তখন বেশী কিছু দেখিবার বা ভাবিবার অবসর হলো না।

তার পরদিন জনতাপূর্ণ এময়ের বাজারে বাঁশের একটি চীনে বাঁশী কিনিতেছি, এমন সময় উচ্চস্বরে বামাকণ্ঠের গান শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, সেই পাগলিনী গাহিতেছে। অপ্রশস্ত রাস্তার দুই ধারের উঁচু উঁচু বাড়িতে সেই গীত প্রতি-ধ্বনিত হ'য়ে কাণে যেন মধু ঢালিয়া দিতে

লাগিল। স্বরটি করুণরসে ভরা। কোনও কোনও স্থানে তার স্বর কতকটা নিম্নলিখিত গানটির মত।

"বৃন্দাবনধন গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে।
দেশ দেশ পর সো শ্যাম-সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে॥"

গাহিতে গাহিতে ক্ষিপ্র-পদ-নিক্ষেপে সে সেই সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে চ'লে গেল। সে ছিন্ন খড়ের টুপীটি তখনও তার হাতে আছে। নিশ্চয় বুঝিলাম সেটি তার সেই প্রিয়জনের স্মৃতি-চিহ্ন। যেন তাড়াতাড়ি কি খুঁজতে যাচ্চে। সে দিন সর্ব্বক্ষণই সে সুরটি আমার কানে লেগেছিল।

যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি ইঁদুর এক গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আর একটি গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তার দেহ ক্ষীণ ও নিস্তেজ। হবেই তো; লোকালয়ই ইন্দুরের থাকিবার স্থান, সমাধিক্ষেত্রে কিরূপে বাঁচিবে। দু'এক স্থানে কিছু কিছু ঘাস দেখিলাম—সে এত ছোট, এত বিবর্ণ যে ঘাস বলিয়াই চেনা যায় না।

পাহাড়টির উপরে উঠিয়া অশ্বথ গাছের মত একটী গাছ দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। উন্মুক্ত হাওয়ায় ঐ গাছের পাতাগুলি মর্-মর্ শব্দ করিতেছে। সেখান হইতে সুনীল সমুদ্রের দৃশ্য কি সুন্দর দেখাইতে লাগিল! চারিদিক নিস্তব্ধ। নিকটে লোকজনের বসতি নাই। উপরে দেখিলাম, একটী চীন-দম্পতি ঝগড়ার স্বরে কথা কহিতে কহিতে পাহাড়ে উঠিতেছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাদের ভাষা আমার কাণে যেরূপ লাগিল, ঠিক তাহাই এখানে লিখিলাম,—

পুরুষ। চি-চিন্-চিঙ্।
স্ত্রী। চি-চিন্-চিঙ্,—হি-চিন্-চিঙ্-ফি-চিম্-চিঙ্।

এইরূপ অনুনাসিক ভাষায় রাগত স্বরে তাহারা কথা কহিতে লাগিল। অঙ্গভঙ্গীর কিছুই বাহুল্য ছিল না; তবুও বুঝা যাইতেছিল, তাহারা কলহ করিতেছে। আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"উহারা কি বলাবলি করিতেছে ?" তিনি বলিলেন, "পুরুষটী ব'লছিল—'আমাকে জানালে না কেন ?' আর স্ত্রীলোকটী ব'লছিল—'জানালেই বা কি হতো ? না হ'লে তো চলতো না'।" শুনে আমার মনে হলো, এতো রূঢ় ভাষা নয়,—এই কি এদের ঝগড়া ? কি বিষয়ে ইহারা ঝগড়া করিতেছে, আমার জান্‌তে বড় কৌতুহল হলো। কিন্তু ভাল ক'রে বুঝা গেল না। পুরুষটী যত কথা কহিতে লাগিল, স্ত্রীলোকটী তার তিন চার গুণ বেশী কথা কহিতে লাগিল। ক্রমে আমরা তাহাদের ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম। তাহারা প্রস্তর-স্তূপের আড়ালে পড়িল, আর দেখা গেল না, শুনাও গেল না।

কিছুদূর যাইবামাত্র দূরে,—নীচের সেই পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। সব বাড়ীগুলিই একতলা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গাঁথা। ছাতগুলি ঢালু,—চক্‌চকে খোলার ; বোধ হয়, পোরসিলেন জাতীয় মাটীর হইবে। ঘরগুলি ছোট ছোট ; একটি করিয়া দরজা আছে, কিন্তু জানালা নাই। এক ঘরে অনেক লোক বাস করে। দুইটী বাড়ীর মাঝে রাস্তা আছে, কিন্তু অতি অপ্রশস্ত। ভাঙ্গা-চোরা আবুড়া-খাবুড়া পাতরের উপর দিয়া চলিতে কষ্ট হয়। চীনে ছেলে-মেয়ে গুলি রঙ্গিন পোষাক প'রে খেলা ক'রচে দেখিলাম। একটী বাড়ীতে একটী ছেলের কাতর কান্না শুনে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাঁদ্‌চে কেন ?" শুনিলাম, একটী শিশু কন্যার পা ছোট করিবার জন্য তার পায়ে লোহার ছোট জুতা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই ব্যথাতে কাঁদ্‌চে। পূর্ব্বেই বলেছি, মেয়েদের ছোট পা, চীন জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। পা তিন ইঞ্চি হইলেই ভাল হয়। সেই কারণে ৫ বৎসর বয়স হইতে তাদের পা ছোট জুতায় আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে তাদের পা আর বাড়িতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া সে যন্ত্রণা থাকে।

সমস্ত পল্লীতে একটীও ভারবাহী গৃহপালিত পশু দেখিলাম না।

গরু নাই, ঘোড়া নাই, আছে কেবল,—কুকুর ও বিড়াল। সে দরিদ্র পল্লীতেও টবে করা ফুল গাছ আছে, খাঁচায় করা কেনারী পাখী আছে। জলের কিন্তু বড়ই অসদ্ভাব দেখিলাম। যেরূপ অল্প জলে তাহারা গৃহের কাজ সারিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইল এ সকল স্থানে মিষ্ট জলের বড়ই টানাটানি। গৃহস্থেরা গৃহস্থও বটে, আবার দোকানীও বটে। সকলেরই এক একটী ছোটখাট কারবার আছে। আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র পরস্পরের নিকট হইতে খরিদ করে। তাহাতেই সামান্য ভাবে তাহাদের দোকান চলে;—তাহাতেই অতি দীনভাবে তাহাদের দিন গুজরান হয়।

একটী ছোট বাড়ীতে দেখিলাম, অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া একটী রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া গোলমাল করিতেছে। শিশুটী বড়ই কাতরস্বরে কাঁদ্‌চে,—কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হ'য়েছে,—আর যেন কাঁদ্‌তে পারচে না। ছেলেদের কান্না শুনলে আমার মন কেমন হ'য়ে যায়। মনে হয় যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কেঁদে উ'ঠল। আমার আর পা চলিল না। সেই খানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গীর নিকট কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জানিয়া বলিলেন যে, শিশুটীর মা আজ দুই দিন হলো মারা গিয়েছে। সে কাহারও কাছে থাক্‌চে না। আজ দুই দিন সে অনবরত কাঁদ্‌চে। কিছু খায় না। শিশুর কান্না শুনে পাড়া-শুদ্ধ মায়েদের আসন ট'লেছে। তাঁরা আর গৃহে স্থির থাক্‌তে না পেরে, আপনাদের ছেলেকে পরের কোলে দিয়ে মাতৃহীন শিশুটীকে নিজ নিজ স্তন্য-দুগ্ধ পান করাবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছেন। ছেলে ভুলাবার জন্য সুর ক'রে কত কি ছড়া বল্‌ছেন। শিশুটী কিন্তু কাহারও মাই ধরচে না। যে শিশুর মা নাই, জগতে তার কেউ নাই; করুণার্দ্র-হৃদয় আত্মীয়-বন্ধুর শত চেষ্টাতেও তার সেই অভাব কখনই পূরণ হয় না।

সেখান থেকে ফিরে আসবার পথে এময় সহরের এক প্রান্তে একটী

ছোট চীন দেশীয় ধর্ম্ম-মন্দির দেখিলাম। পূর্ব্বে আরও অনেক ধর্ম্ম-মন্দির দেখিয়াছি। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-মন্দির এবং পিনাঙ, সিঙ্গাপুর ও হংকং সহরের ধর্ম্ম-মন্দিরও দেখিয়াছি; কিন্তু তথাকার ভাষা জানি না বলিয়া বিশেষ কিছুই বুঝিয়া লইতে পারি নাই। সুইচিন্ নামক এই বন্ধুটীর নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক শিখিলাম।

আমরা চিরকাল জানি, চীনেম্যানরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু চীন দেশীয় ধর্ম্ম-মন্দির ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমার দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মন্দিরের মধ্যে যমদূতের মত মূর্ত্তি স্থাপিত;—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি কদাচ দেখা যায়। পুরোহিতদের মুণ্ডিত-মস্তক, গেরুয়া পোষাক-পরা, কতকটা "ফুঙ্গী"দের মত দেখিতে। বাতি জ্বালাইয়া ধূপ-ধুনা দিয়া পূজা করা হয়; এ সকল বিষয়ে ঠিক ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত; কিন্তু মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কি চীন, কি ব্রহ্ম দেশ, আহার্য্য দ্রব্য সমেত নৈবেদ্যের কোথাও ব্যবস্থা নাই। তবে ব্রহ্মে ফুল দিয়া পূজা করে, চীনে তাহা দেখিলাম না। চীনে পূজার সময় কাঁসর, চীনে ঢাক ও ভেঁপু বাজায়; ব্রহ্মদেশে কিন্তু নিস্তব্ধ উপাসনা। ব্রহ্মে অনেকে মৃতদেহ দাহ করে, চীনে গোর দেয়।

এই সকল বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সুইচিনকে, চীন দেশে কিরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রচলিত, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অল্প কথায় যাহা বুঝাইয়া দিলেন, তাহা হইতে আমি এই বুঝিলাম যে, চীনে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অতি অল্পসংখ্যক লোক, যাঁহারা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, তাঁহারাই কেবল বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী। তদ্ব্যতীত চীন দেশীয় অধিকাংশ লোকই পূর্ব্ব-পুরুষ উপাসক। পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদের থাকিবার জন্য প্রতি ঘরে এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এইটাকেই তাহারা গৃহ-দেবতাদের স্থান বলিয়া মনে করে। বিবাহাদি শুভ কার্য্যে এই স্থানে উপাসনা করা একটী প্রধান অঙ্গ।

"তেওস্ত" ধর্ম্ম ইহারই রূপান্তর মাত্র। যে সকল মন্দিরের কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, সেগুলি "তেওস্ত" ধর্ম্ম-মন্দির। সেথানে রক্ষিত ভীষণাকার বীরমূর্ত্তি সকল চীন জাতীর বীর পূর্ব্বপুরুষগণ। যেমন গৃহে গৃহে সেই গৃহের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তেমনি নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে চীন জাতির পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত। ইহাঁরা সকলেই বীরত্বের দ্বারা চীন জাতিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ইহাঁদের উপাসনা হয়। "তেওস্ত" ধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম। তাই এই সকল মন্দিরে কেবল বীরমূর্ত্তি। একটীও সৌম্যমূর্ত্তি বা স্ত্রীমূর্ত্তি বা বালক মূর্ত্তি নাই। এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা শৌর্য্যবীর্য্যের উপাসক,—সৌন্দর্য্য বা সদ্‌গুণের উপাসক নহে। আবার এই সকল মন্দিরের মাঝে মাঝে শ্বেত-পাতরে খোদা বা পিত্তলে গড়া বুদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তিও দেখা যায়। দানবের পাশে বিশ্বপ্রেমের শ্রেষ্ঠ দেবতাকে দেখিয়া চোখ জুড়ায়। ধ্যানস্তিমিত কাঁদকাঁদ মুখ খানি দেখিলে চোখে জল আসে। শুধু তো মানুষ নয়, কীট-পতঙ্গের শুভ কামনাও সে প্রেমে ঠাঁই পেয়েছিল।

"কনফিউসসের" (কংফুচী) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত বলিলেও চলে। এটী নিরীশ্বর-বাদ। ইহা কেবলমাত্র সদ্‌গুণের উপাসনা। সে সকল কঠিন কল্পনা সাধারণের পক্ষে সচরাচর অসাধ্য বলিয়াই, এই ধর্ম্মের বিষম বিকৃতি হইয়াছে।

চারিটী ধর্ম্মের কথা বলিলাম,—বৌদ্ধ ধর্ম্ম, পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা, পৌত্তলিক "তেওস্ত" ধর্ম্ম বা বীরপূজা ও কনফিউসস্ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ বা কেবলমাত্র সদ্‌গুণের উপাসনা। এ চারিটী ছাড়া চীন দেশে আজকাল খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সাধারণ চীন বাসীর, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারীদের উপর বড়ই বিদ্বেষ। এই আক্রোশের ফলেই "বক্সার" বা মুষ্টি-যোদ্ধার হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল।

বিদেশীয়দের উপর যত ক্রোধ থাকুক বা না থাকুক, স্বদেশীয় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারীদের বিনাশই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কত চীনে খৃষ্টান যে এই ব্যাপারে বিদ্রোহীর হস্তে হত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

অথচ খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সে দেশে কত যে লোক-হিতকর কার্য্য করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বতই মনে কৃতজ্ঞতার ভাব আসে। অতি বিপদসঙ্কুল স্থানেও তাঁহারা অধিষ্ঠান করিয়াছেন; বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেছেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কূপ খনন করিয়া দুষ্প্রাপ্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্তের অন্ন দেন, রুগ্নের চিকিৎসার ভার লয়েন। চিকিৎসার জন্য সুন্দর হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সন্তান বিক্রয়।

যাহাতে জলে ডুবাইয়া শিশু কন্যা হত্যা করা না হয় তার জন্য তাঁরা সদাই সচেষ্ট। বাজারে কেহ ছোট ছেলে বা মেয়ে বিক্রয় করিতে আনিলে, ইহাঁরা তাহাদিগকে কিনিয়া লন ও নিজেরা তাহাদের লালনপালন করেন। দরিদ্র প্রতিবেশিনীগণের নানাপ্রকারে তাঁহারা সাহায্য করেন। আমি এক বেলা ঘুরে ঘুরে এ সব দেখিলাম—ও হুইচিন্ সেই খানে নিয়ে গিয়ে নিজে আমাকে সবই দেখালেন। দেখে

আমার মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। কত দূরদেশের লোকদের শ্রমসঞ্চিত অর্থদ্বারা এই সকল হিতকর কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। যাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে জানে, তাহারাই অর্থের সদ্ব্যয় বুঝে। প্রতি কার্য্যেই কি সুনিয়ম; কি সুশৃঙ্খলা! এই সমস্ত দেখিবার সময় আমার বার বার মনে হ'তে লাগিল, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার উপযুক্ত গুণ ইহাঁদেরই আছে।

এই মন্দির হইতে আরও কিছুদূর যাইলে একটী বিস্তৃত খোলা মাঠ দেখা যায়। এই স্থানে বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া গরু, ভেড়া ঘোড়া ইত্যাদির হাট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চীনদেশে গৃহপালিত পশুর বড় ব্যবহার নাই,—তার একটী কারণ, ঐ সকল ঘনবসতির দেশে বন নাই, সুতরাং ও সকল পশু জন্মিবে কোথা? দূরদেশ হইতে আনীত ঐ সকল পশু তথায় বিক্রয় হয়। সারা বছরের মত সওদা করিতে হইবে বলিয়া ঐ কয় দিন তথায় জনতার আর অবধি থাকে না।
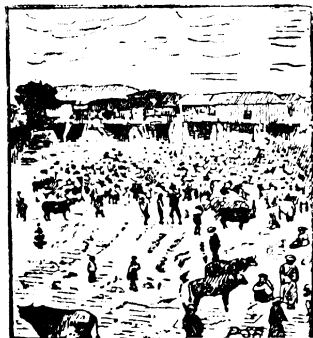
পশু বিক্রয়ের হাট।

পদব্রজে এই সকল স্থান দেখিয়া ফিরিতে এত ক্লান্তি বোধ হইল যে, আর দাঁড়াইতে পারি না। অসুস্থতা নিবন্ধন সমুদ্রে হাওয়া খাইতে গিয়া চীনদেশে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। কেবল নূতন দেশ দেখার উৎসাহে এতটা ঘুরিতে পারিয়াছিলাম, তাতে সামর্থ্যের চেয়ে এত অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছিল

যে, চোখে আর দেখতে পেলাম না। স্থইচিন আমাকে নিকটবর্ত্তী একটি দরিদ্র চীনে গৃহস্থের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন ও চীনে ভাষায় কি বলিলেন। একটী স্ত্রীলোক আমাকে এক পেয়ালা জল দিলেন; আমি শুধু মুখে দিলাম। সেই ঘরেই গৃহকর্ত্তা ছুতারের কাজ করিতেছিলেন,—গৃহিণী গৃহ কর্ম্ম করিতেছিলেন। ঘরখানি ছোট কিন্তু অতি সুব্যবস্থায় জিনিষ পত্রগুলি রক্ষিত। তাঁরা ঐটুকু ছোট ঘরে পরম সুখে বাস করেন,—যেন একটী খোপে দুটী পায়রার মত। তাঁদের ছোট মেয়েটি দেখিতে ঠিক আমারই মেয়েটীর মত।

কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিয়া সে দিনকার মত জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। স্থইচিন নিজে আমাকে জাহাজে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

———

এময়।

[চতুর্থ প্রস্তাব।]

পরিশ্রম করিলে ঘুম আসে, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম করিলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় ;—বিশেষ যদি ঘুমাইবার সময় অতি আনন্দ বা অতি চিন্তার ফলে, নূতন নূতন বিষয়ের ছবি আসিয়া অহরহ স্বপনের মত মুদিত চক্ষের সামনে দিয়া চলিয়া যায়। আমার তাহাই হইয়াছিল। চখে নিদ্রার লেশমাত্র আসিল না। অথচ তাহাতে তত অসুস্থ বলিয়াও মনে হইল না। সেই রাত্রে উঠিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা নোটবহিতে লিখিয়া রাখিলাম, এবং পরে ডেকের উপর গিয়া ওভার কোট গায়ে ও কম্বল মুড়ি দিয়া ডেকচেয়ারে বসিয়া গভীর রাত্রে চীনদেশের ঘুমন্ত সহরের শান্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। তখন শুক্লপক্ষ। দ্বাদশীর চাঁদ নীলাকাশ হইতে সুষুপ্তা ধরণীর উপর সুধা ঢালিতেছিল ; সমুদ্রের ঢেউগুলি চন্দ্রালোক গায়ে মাখিয়া জ্বলিতেছিল। দূরস্থ এময় সহরের বাড়ীগুলি ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অল্পই দেখা যাইতেছিল। শব্দের মধ্যে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, তরঙ্গের কুল্ কুল্ রব, ও এময় সহরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নাট্যশালার মধুর সঙ্গীতধ্বনি।

নাট্যশালা এত কাছে বলিয়া দেখিতে বড় ইচ্ছা হ'তে লাগিল। সুইচিনও দেখিবেন বলেছিলেন। কিন্তু জাহাজের বৃদ্ধ বিচক্ষণ কাপ্তেন রাত্রে সে সকল স্থানে যাওয়া নিরাপদ নহে বলিয়া মানা করিলেন। দূর হইতে শুনিতে লাগিলাম, এক একবার সঙ্গীতের স্বর অতি ক্ষীণ হইয়া যায়, আবার এক একবার কাঁসরের শব্দের মত, এক

প্রকার শব্দ-সংযোগে তুমুল ধ্বনিত হয়। চীনে গান, চীনে বাঁশীর রব শুনিয়াছি—সবই যেন করুণ-রস-ব্যঞ্জক। শুনিতে অনেকটা আমাদের দেশের ধ্রুপদের মত। চীনেরা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যাহারা এত ফুল ভালবাসে ও প্রতি কাজে এত সুব্যবস্থায় থাকা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের সঙ্গীতে অনুরাগ না হওয়াই আশ্চর্য্য।

অভিনয়ে পুরুষেই স্ত্রীলোক সাজে। এ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা এতই বেশী যে, দশজনার সামনে ও রঙ্গমঞ্চের উপর নাচাইয়া প্রকৃতিদত্ত স্ত্রীমর্য্যাদার হানি করা চীনেরা বর্ব্বরতা মনে করে। অতি পবিত্র জিনিষ অপবিত্র করিয়া পবিত্রতার অবমাননা করা হয়। চীনদেশে বিস্তর নাট্যশালা আছে ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বহু লোক তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। এ সব কথা আমি হংকং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রবন্ধে বলিয়াছি। বক্সার গোলমালের সময় ইউরোপীয় জাতিগণ সসৈন্যে যখন পিকিন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, অমন দুর্দ্দিনে,—অমন উপদ্রবের সময়ও—পিকিনের গলিতে গলিতে নাট্যাভিনয় হইত।

নাটকের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত তেওস্ত ধর্ম্মোক্ত বীরকাহিনী। মন্দিরে যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, তাঁহাদেরই জনশ্রুতিমূলক অতিরঞ্জিত আখ্যায়িকা নাটকের বিষয়ীভূত;—"সরলা" বা "বিষবৃক্ষের" মত সংসার-চিত্র নহে। নানা রঙ্গের চিত্র-বিচিত্র যে সকল চীনে ছবি, এবং চীনদেশের—চীনে মাটিতে গড়া মহামূল্য সচিত্র পাত্র আমাদের দেশেও সাহেবরা বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য রাখেন, সে ছবিগুলিও সব ওই সকল ব্যাপারেরই চিত্র,—মনগড়া যা'তা ছবি নয়।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ডেকের উপর শীতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। প্রাতে চোখ মেলিয়া দেখি, রৌদ্র উঠিয়াছে। ওরূপ শীতে, ওরূপ অনাবৃত স্থানে, আমাদের দেশে ঘুমাইলে নিশ্চয়ই শরীর অসুস্থ হইত; কিন্তু সেখানে কিছুই হইল না।

সে প্রচণ্ড শীতে একরূপ শুষ্ক ভাব আছে,—আমাদের দেশের মত হিম পড়ে না। সেই কারণেই, সে ঠাণ্ডা তত অনিষ্টকর হয় না। নতুবা কলিকাতায় আমরা অত শীত কখনও দেখিতে পাই না। বোধ হয়, গাছপালাহীন পাতরের দেশ বলিয়াই শীতের এত আধিক্য।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল আমার একই চিন্তা আসিত—কখন তীরে নামিব, কখন সুইচিনের সহিত দেশ দেখিতে যাইব। সুইচিনের সহিত আমার প্রথম দিনেই জাহাজে আলাপ হয়; আমি ব্যস্ত হইয়া আলাপ করিবার মত লোক খুঁজিতাম,—সুতরাং প্রথম সাক্ষাতেই,—চারিচক্ষু এক হইবামাত্রই আলাপ হইয়া গেল। আলাপে যে আমার কত সুবিধা হইয়াছিল, তা' বলিবার নয়।

তিনি জাহাজের এজেণ্ট; সুতরাং তীরের নিকটেই তাঁহার আফিস। আর চীনদেশের লোকের একটী প্রথা দেখিলাম,—তাঁহারা যেখানে কাজ করেন, সেইখানেই বাস করেন। সাজিয়া গুজিয়া দূর হইতে আসিয়া আফিস করিতে হয় না। ইহার ফলে তাঁহারা দিন-রাতই কাজ করিতে প্রস্তুত। যাঁহারা কলিকাতায় চীনে জুতাওয়ালা-দের দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা ইহা বুঝিবেন। সুইচিন সপরিবারে ঠিক তীরের উপর একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। ঘণ্টা কতকের মধ্যে এত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল যে, দিনে ৪।৫ বার তাঁর বাড়ী যাইতাম। তিনি জাহাজের এজেণ্ট বলিয়া আমার আর সাম্পান্ ভাড়া লাগিত না। তিনি সব মাঝিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে যেন তাহারা ভাড়া না লয়। আমি কিন্তু বক্‌সিস্ বলিয়া তাদের বেশী বৈ কম দিতাম না। আমাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেখিলেই তাহারা ৫।৭ খানি নৌকা আনিত। সকলেরই আগ্রহ,—আমি তারই নৌকায় চড়ি!

এই সকল সুবিধা থাকায়, একটু সুযোগ পাইলেই সুইচিনের বাড়ী

যাইতাম। তিনিও সকল কাজ ফেলিয়া আমাকে লইয়া থাকিতেন। ঘন ঘন আসাতে তাঁহার কাজের ক্ষতি হইতেছে, এ কথা বলিলে তিনি বলিতেন,—"কাজ তো নিত্যই থাকিবে, বিদেশী বন্ধু তো চিরকাল থাকিবেন না।" হংকং সহরে যে পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করার কথা লিখিয়াছি, তাঁহারা অতি উচ্চ-বংশীয় ধনী লোক,—ক্রোরপতি। তাঁদের সহিত এমন মেশামিশির সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু সুইচিন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক মাত্র। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেই সকল স্থানে, সকল দেশের ভিত্তিস্বরূপ। তাদের সহিত আলাপেই দেশের রীতি নীতি বেশ বুঝা যায়। সেই কারণেই সুইচিনের বাড়ী আমি এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ আমার এত ভাল লাগিয়াছিল।

তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতা। তিনি কানে শুনতে পান না। পিতা বহু বৎসর হইল গত হইয়াছেন। তাঁহারা দুই ভাই,—দুই ভায়েরই স্ত্রী আছেন। সুইচিনের একটি মেয়ে, একটী ভগিনী। ভগিনীর এক পা খোঁড়া; জুতা পরানর দরুণ নহে, তাঁহাদের বাড়ীতে কাহারও পা ছোট নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় বিষম অবস্থায় প্রসূত হওয়াতে পা খোঁড়া হইয়াছে। বোধ হয়, সেই কারণেই আঠার বৎসর বয়সেও তিনি অবিবাহিতা। বৃদ্ধ মাতার সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে না দেখিলে মা থাকিতে পারেন না। অতি সামান্য কাজের সাহায্যের জন্য বার বার তাঁহাকে ডাকেন। তিনি সাড়া দিলেও বধিরতা বশতঃ শুনতে না পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে কত কি বকেন। মেয়ের প্রশান্ত মুখে তাহাতে কখনও প্রীতি বৈ অন্য কোনও ভাবের উদ্রেক হয় না। ইঁহার স্বভাব অতি মধুর দেখিলাম। নিজের বিকল অঙ্গের কথা যেন সর্ব্বদাই তাঁর মনে

জাগে। তার জন্যে যেন তিনি বড়ই মনোকষ্টে থাকেন। তাঁহারা সকলেই মিলে-মিশে পরম সুখে আছেন। প্রথম দিন হইতেই তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত আমার অল্প-বিস্তর আলাপ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলেছি, চীন দেশের স্ত্রীলোকের মত অমন শান্ত লজ্জাশীলা গম্ভীর প্রকৃতির রমণী আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের চ'খে বড়ই ভাল লাগে। তাঁহারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন—যেখানে যখন ইচ্ছা, যাতায়াত করিতে পারেন। অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মত সমাজে অনেক অধিকারেই বঞ্চিত।

একদিন বৈকালিক চা-পান করিবার সময় সুইচিনের সহিত চীনদেশে স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, চীনদেশে স্ত্রীলোককে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। শুধু চীন দেশে কেন, সকল প্রাচীন দেশেই এই প্রথা ছিল। সেখানে শিশু-কন্যা জন্মিলেই সকলেই দুঃখে ম্রিয়মান হয়। প্রকাশ্যে শিশু-কন্যা জলে ডুবাইয়া মারার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ রদ হয় নাই। শিশু বিক্রয় তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধূকে শ্বাশুড়ীর হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারিলে মারিতে পারেন, রাখিলে রাখিতে পারেন। স্বামীর স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার একটী কারণ, শ্বাশুড়ীর সহিত ঝগড়া ও অপর কারণ, বেশী কথা কওয়া! স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ হয় না; তবে অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা স্ত্রীর মত থাকা চলে। সহমরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে যেমন চিতারোহণে সহমরণ হয়, এ তেমন নহে। এখানে সকলের সামনে গলায় দড়ি দিয়া মরাই প্রথা। বিধবাকে একটী মঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া, তাহার গলায় দড়ি পরাইয়া দিয়া মঞ্চটী সরাইয়া লওয়া হয়; আর সকলের চোখের সামনে উদ্বন্ধনে বিধবার প্রাণ যায়। তাহাতে দর্শকগণ 'ধন্য ধন্য করিতে

থাকেন। সে স্থানে রাজ্যের সরকারী খরচে একটী পবিত্র স্মৃতি-স্তূপ গাঁথা হয়। এইরূপ একটী স্তূপের ছবি আনিয়াছি, উপরে তাহারই প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের সহিত চীনের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কতকটা মিলে। কেবল প্রভেদের মধ্যে, চীনদেশে অবরোধপ্রথা ও বহু-বিবাহ প্রচলিত নাই। এই বহু-বিবাহ প্রথা কেন যে নাই, তাহারও কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। এসিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই এ প্রথা দেখা যায়। ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, ইউরোপে ইতিহাসে যত দিনের কথা উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বহু-বিবাহ কখনও কোথাও প্রচলিত ছিল না। এমন কি, অতি প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে কখনও এ প্রথার আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। বহু-বিবাহ চীনেও নাই; শুনেছি নাকি জাপানেও নাই। তাই জাপান উঠিয়াছে,—চীনও অচিরে উঠিবে; কিন্তু যে দেশে এই জঘন্য প্রথা প্রচলিত থাকিবে সে দেশের উন্নতির আশা নাই।

[পঞ্চম প্রস্তাব।]

স্ত্রী-জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা আমি পূর্ব্বেও অন্যের নিকট শুনিয়াছিলাম। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কন্‌ফিউসসের প্রচারিত নিয়মমতে তাহাদের কোনও রূপ স্বাধীনতাই ছিল না। বাল্যাবস্থায় পিতামাতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন,—এই অধীনতাই তাকে সারা জীবন সহ্য করিতে হয়।* বিধবা দিনে একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবে, সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া ঘুমাইবে। সকলের চ'খের সামনে অবরুদ্ধ ভাবে থাকা চাই। ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোর নীতির কথা সুইচিনের মুখে শুনিয়া তখন আমার মনে হলো, শুধু চীনেই বুঝি এরূপ অত্যাচার প্রচলিত। সুইচিনকে ওই সম্বন্ধে দু' একটী হিতোপদেশ দিতে লাগিলাম। সব কথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া না বলিলে চলে না। সুইচিন আমার সব কথাগুলি তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। কি বলিলেন,—বেশ বুঝিলাম, আমার সম্বন্ধেই কি কথা হইল! ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিলেন? সুইচিন বলিলেন,—"স্ত্রী বল্‌চেন,—'ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী-জাতির উপর বিশেষ সহানুভূতি দেখচি'।" তাঁহার এ কথাগুলি ব্যঙ্গোক্তি, কি তাঁহার

---

* এ সম্বন্ধে আমাদের মনুর মতের সহিত কন্‌ফিউসসের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। মনু-সংহিতায় আছে,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবীরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

মনের প্রকৃত ভাব, ঠিক তাহা বুঝা গেল না। বোধ হয়, ব্যঙ্গোক্তি নহে। কারণ চীনদেশের স্ত্রীলোকদের সরলতার তুলনা নাই।

আমিও যেমন নূতন লোক দেখিতে গিয়াছিলাম, তাঁহারাও তেমনি নূতন লোক দেখিতে আসিতেন। আমি যাইলেই সকলে আমাকে ঘিরে বসিতেন। তাঁহাদের ভাষা জানি না বলিয়া সুইচিন ও তাঁহার ভাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। তবে সঙ্কেতে অনেক ভাব বুঝা যাইত। পুরুষরা কেহ না থাকিলে যদি আমি তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম, সুইচিনের ভগিনী তাঁহাদের আফিস হইতে ইংরাজী বুঝেন এমন লোক ডাকাইয়া আনিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমি বলিতাম, "আমার বড় ইচ্ছা করে—চীনে ভাষা শিখিয়া আপনাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা কই।" তিনি বলিতেন, "আপনি এক মাস আমাদের কাছে থাকুন, আমরা চীনে ভাষা সব আপনাকে শিখাইয়া দিব।"

কিন্তু সুইচিনের বৃদ্ধা মাতার চক্ষে আমি বড় প্রিয় হইতে পারি নাই। প্রথম সাক্ষাতের দিন তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তোমার মা আছেন? তোমরা ক-ভাই।" তার পর আর বড় একটা কথা কন নাই। মনে হতো, তাঁহার মেয়েটির সহিত আমি বেশী মেশামিশি করি, সেটা তাঁর বড় ভাল লাগিত না। বয়স্থা আইবুড়া মেয়েকে সামলে বেড়ান যেমন আমাদের দেশের প্রবীণাদের মধ্যে দেখা যায় তাঁহাকেও সেইরূপ দেখিলাম।

তাঁদের বাড়ীতে দু'দিন আহার ক'রে ছিলাম। আজ শেষ দিন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে একত্র এক টেবিলে বসিয়া আহার করেন না; আমার অনুরোধে বসিয়া রহিলেন মাত্র। তাঁরা নিজেদের দেশের মতই আহার করিতেন। এময়ের নিকটস্থ যে দ্বীপে বিদেশীরা বাস করেন, সেইখানকার ফরাসী হোটেল হইতে

আমার খাবার আনাইতেন। তাঁদের দেশের যে যে খাবার খাইতে আমার ভাল লাগিতে পারে, সেগুলি দেখাইতেন ও তাহার উপকরণ বলিয়া দিতেন। আমি দুটী একটী চাকিয়াছি মাত্র,—তার আস্বাদ আমার ভাল লাগে নাই। সব জিনিষই সিদ্ধ করিয়া রাখা—তাতে মোটেই মসলা নাই; আমাদের মুখে খাইতে বেতার হইলেও উহা সহজে হজম হয়। এত মাছ, কিন্তু যে গরম গরম মাছ ভাজার মত উপাদেয় সামগ্রী আর নাই, তা চীনেরা খাইতে জানে না। পরিমাণে ইহারা এত অল্প আহার করে যে, আমরা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা বেশী খাইতে পারি। "চপ-ষ্টীক্" দিয়া তাহাদের মত একটী একটী করিয়া ভাত মুখে তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অভ্যাস দোষে আপনা আপনিই বিস্তৃত মুখব্যাদান হইয়া পড়িতে লাগিল! অন্য কোনও দেশের লোক হইলে এইরূপ অনভ্যাসের কাণ্ড দেখিলে হাসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল না। শেষে তাহা আর ভাল লাগিল না,—চামচে করিয়া আহার করিলাম। তাঁহারা যখন অর্দ্ধেক মাত্র শেষ করিয়াছেন, আমার তখন আহার শেষ হইয়া গেল।

এই সময়ে বাহিরে একটী গোলমাল উঠিল। যেমন সব দেশেই হ'য়ে থাকে, স্ত্রীলোকরা আগে জানালা দিয়ে দেখতে ছুটলেন। এময়ের বাজারে একজন আফিম-খোর শীর্ণকায় বৃদ্ধ চীনেম্যান এক আফিমের দোকান হতে ৫ সেণ্ট (৪ পয়সা) মূল্যের আফিম চুরি ক'রেছে, তাই অনেক লোক মিলে একত্রে তাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করচে। যাদের দ্রব্যে হাত দিয়েছে, তারা কেহ নাই; অন্যে, হয়ত অপরাধ না জানিয়াই মারচে। অত মার খেয়েও সে কাঁদচে না বা মিনতি করচে না। আমার মনে হ'তে লাগল, যেন তার মারখেলেও লাগে না; অপমানিত হইলেও আসে যায় না। বেশী আফিম খেলে মানুষের শরীরের ও মনের অবস্থা এমনই হ'য়ে থাকে। তার পর

তাকে বিনানী ধরে টান্‌তে টান্‌তে চীনে থানায় নিয়ে গেল। এই স্থত্রে চীনদেশের অদ্ভুত বিচার ও অমানুষিক সাজা সম্বন্ধে অনেক কথা স্থইচি-নের নিকট হইতে শুনি-লাম।
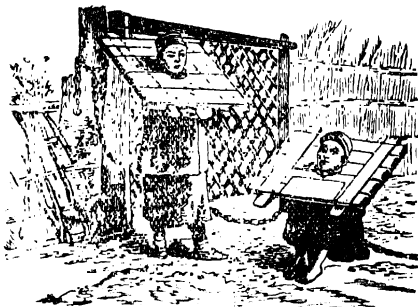
চীন দে-শের বিচার যেমন, সা-জাও তদ্রূপ। দোষীর বি-রুদ্ধে হাজার প্রমাণ থাকুক, সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার না করিলে তাহার সাজা হইবে না। এই জন্য নিজ মুখে দোষ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে সে ব্যক্তিকে কত যে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তার ইয়ত্তা নাই। সাজাও সেইরূপ লোমহর্ষণ। হংকং, এময় প্রভৃতি স্থানে আমি অনেক রকম সাজা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি।

অল্প দোষের জন্য হাতে শিকল বাঁধিয়া গলায় কি পায়ে তক্তা বাঁধা হয়,—তাহাতে দোষীর দোষ ও সাজার কথা লেখা থাকে। এই অবস্থায় সে ব্যক্তিকে সকলের সামনে,—রাস্তার ধারে বা বাজারে রাখা হয়। উদ্দেশ্য এই যে,—অন্যে দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইবে। আর এক রকম সাজা এইরূপ,—দোষীকে অতি ছোট এক প্রকার খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়। সে খাঁচায় নড়িবার-চড়িবার স্থান নাই। এই কষ্টকর অবস্থায় তাকে বহুক্ষণ,—কখনও বা বহু দিন ধরিয়া আবদ্ধ

রাখা হয়। গুরু অপরাধে এমনও সাজা আছে যে, দোষী ব্যক্তির পায়ের বুড়া অঙ্গুলে দড়ি বাঁধিয়া মাথা নিচু করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয়! বিষম যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। প্রাণদণ্ড ত কথায় কথায়; দোষের গুরু লঘু বিচার নাই। তিন চারিবার দোষ করিলেই তার প্রাণদণ্ড হয়; তা যে দোষই হউক না কেন।

দোষী যেখানে দোষ করে, সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহার সাজা দেওয়া হয়। খাঁচায় পুরিয়া পালকীর মত করিয়া নানা স্থানে লয়ে যাওয়া হয় বলিয়া এরূপ দৃশ্য পথে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশের মত জেলখানা বা অন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাজা হইলে এরূপ দেখাযাইত না।
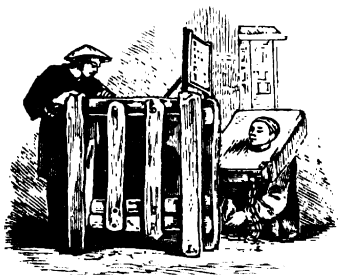
আর চীন দেশে পিতামাতার প্রতি ভক্তি এরূপ সদ্‌গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় যে, খুনী ব্যক্তিরও সাজার সময় যদি পিতা কি মাতা আসিয়া সপথ করিয়া বলেন যে, ছেলে তাদের কখনও অবাধ্য হয় নাই—তাহা হইলে সেরূপ দোষী ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

চীন দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত। ইংরাজী অতি সামান্য লোকই জানেন। আর যাঁহারাও বা জানেন, তাঁহারাও আবার সামান্য "পিজন ইংলিস্" মাত্র। চীন ভাষাতেও ভালরূপ লিখিতে ও পড়িতে অধিকাংশ লোকেই জানেন না। সে ভাষাও অতি দুরূহ।

আমি খুব চেষ্টা করিয়াও সামান্য আবশ্যকীয় দু'চারিটী কথা ভাল করিয়া শিখিতে পারি নাই। চীন ভাষাটী মনুষ্যজাতির অতি আদিম অবস্থার ভাষা। শব্দগুলিতে বিভক্তির কোন পার্থক্য নাই। যে কথার মানে "আমি," সেই কথাই "আমার" "আমাকে" ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি কথাটী একটী ছবির মত হরফে লেখা হয়। ছত্রগুলি ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে লেখা হয়। আমি জাহাজের একজন চীনে কর্ম্মচারীকে "পীড়িত" এই কথাটী চীনে ভাষায় লিখিতে বলিলাম; তিনি পারিলেন না। বলিলেন,—"ও কথাটী আমি শিখি নাই!" ইহা ছাড়া চীনে ভাষা শিখিবার আর এক অসুবিধা এই যে, অতি নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে, এক জন অপরের কথা বুঝিতে পারে না। আমি মুখস্থ করিয়া শিখিয়াছিলাম,— "থী মান্ সান্" মানে, "আমাকে বাজার দেখাতে নিয়ে চল", গাড়ী ওয়ালাদিগকে বলিলে কেহ বুঝিত, কেহ বুঝিত না।

কিন্তু যদিও কথার উচ্চারণে প্রভেদ দেখা যায়,—তথাপি লিখিত ভাষা চীনের সকল স্থানেই সমান। লেখার কোনও প্রভেদ নাই। যাহারা কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা লিখিলে পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারে। এরূপ যে শুধু চীনেই আছে তাহা নহে,—ইউরোপেও কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি জার্ম্মাণ, কি ইটালিয়ান সকলেরই লিখিত ভাষা রোমান্,—কিন্তু ভাষা গুলির উচ্চারণ এবং অন্য অনেক বিষয়েই প্রভেদ।

চীনে বিদ্বান লোকের বড়ই সম্মান। কালি কলম কাগজ ইত্যাদি লিখিবার উপকরণ সকল দেবতার দ্রব্য বলিয়া গণ্য। লোকে পুণ্য কাজ বিবেচনায় পথে ছেঁড়া কাগজ ও বই কুড়াইয়া বেড়ায়। সেগুলি ফেলিবার জন্য রাস্তার ধারে ঝুড়ী রক্ষা করা হয়। সেখান থেকে

সেগুলি আবার মন্দিরে নীত হইয়া আগুন দিয়া দগ্ধ করা হয়। সেই ছাই মাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। নৌকা ও জাহাজের মাঝিরা সে ছাই ক্রয় করে। ঝড়ের সময় সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলে উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশান্ত হয়, চীনেদের এইরূপ বিশ্বাস।

ছয় বৎসর বয়সের সময় শিশুর "হাতে খড়ি" হয়। হাতে খড়ি একটা মহোৎসবের দিন। শিখিবার সকল বিষয়ই মুখস্থ করান হয়। কোনও ছেলে ভাল পড়া বলিতে পারিলে, তাহাকে শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরাইয়া সেই পড়া মুখস্থ বলিবার আদেশ করা হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে তাহার প্রশংসার আর সীমা থাকে না। তারের ভিতর দিয়া কাঠের বল পরান একরূপ যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব শিখান হয়। তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় হিসাব করিয়া তাহারা ঠিক উত্তর দিতে পারে। এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া রাজ্যের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। গুণ অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়; যাকে তাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইবার রীতি নাই।

হংকং যেমন পরিষ্কার সহর, এ সহরের স্থানে স্থানে তেমনি অপরিষ্কার। রাস্তাগুলি ৭ ফুটের অধিক চওড়া নয়। তাহার দুই পাশে উচু উচু পাথরের বাড়ি। রাস্তায় কত যে লোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঠেলা-ঠেলি ক'রে রাস্তা চল্‌তে হয়। রাস্তা গুলিও পাথরে বাঁধান; কিন্তু পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা না থাকায় অতিশয় ময়লা হইয়া থাকে। মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় পাত্র রক্ষিত আছে। তার দুর্গন্ধে রাস্তা চলা ভার!

প্রতি দোকানের দরজার উপর দেবতার নাম লেখা কাগজ ঝুলান। কলিকাতায় প্রবাসী চীনেমানদের দোকানেও এইরূপ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ধর্ম্ম-মন্দির। তার মধ্যে একটী ধর্ম্ম-মন্দিরে মুণ্ডিত-মস্তক

গেরুয়া পোষাক পরা ইংরাজী জানা একজন পুরোহিতের কাছে "কন্‌ফিউসিয়স্", "লোট্‌জী" প্রভৃতি কতকগুলি চীন-ধর্ম্ম সংস্কারক-দের ইতিবৃত্ত শুনিয়া মনে বড়ই ভক্তি ও আনন্দ হইল। সে সকল কথা বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে। সময়ান্তরে উহা সবিস্তারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এময়ে কাঠের ও পাতরের কারুকার্য্য অতি বিস্ময়কর। ছোট ছোট গাছের আস্ত কাঠের গুড়ির উপর দুই চারিটি বাটালীর ঘা দিয়া চীনেরা যেন সজীব প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করে। বীরের হাবভাব ও ভ্রূকুটীপূর্ণ হাসি, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। এইরূপ তিনটি মুর্ত্তি, দশ ডলার মূল্যে, আমি সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই তাহার মধ্যে এক একটি, সিঙ্গাপুর হইতে আনীত কতকগুলি প্রবালসহ, যাঁহারা যত্ন করিবেন এমন লোক বুঝিয়া উপহার দিলাম। ছোট ছোট পাতর দিয়া প্রস্তুত করা ন্যান্‌কিন্ সহরের বিখ্যাত পোরসিলেনের ধর্ম্ম-মন্দিরের একটি প্রতিমূর্ত্তিও সঙ্গে আনিয়াছি। টেপিঙ্ বিদ্রোহের সময় এটি বিদ্রোহি-হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে। দেখিতে এত সুন্দর ছিল যে, ইহার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া চীনেরা বাজারে বাজারে বেচিয়া বেড়ায়।

আর আনিয়াছি দুইটি কৃত্রিম ফুলের বাক্স। ফুলপ্রিয় চীনেরা মোম-মাখান কাগজ ও কাপড়ে রঙ দিয়া ওই অঞ্চলের সব ফুলের আকৃতি গড়িয়া, একত্র সাজাইয়া, একটি কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া, ফুলের সাধ মিটায়। তার রঙ আর আকৃতি এত সুন্দর যে কৃত্রিম ব'লে মনে হয় না। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন তাহা হইতে সুগন্ধ অবধি ছুটিতেছে। একটি যে ঘরে শুই ও অপরটি যে ঘরে বসি সেই ঘরে যিনি বড় ফুল ভাল বাসিতেন তাঁহার ছবির তলায় রাখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে চোখ তুলিলেই দেখা যায়। দেখিলেই সজীব ব'লে মনে হয়। রঙ্ করা ফুলদলের উপর মোম নির্ম্মিত মধুকরকে

উন্মত্ত হইয়া মধুপান করিতে দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় যেন তার মনভুলান অনুচ্চ মধুর গুঞ্জন অবধি শুনা যাচ্ছে। জাপানের "ক্রসেন্থিমম্", তার ভিতর সকলের মধ্যস্থলে রক্ষিত। আশ-পাশের বন-বাদাড় থেকে কীট-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ঘরে উড়ে আসে—আর কাচ ঢাকা সেই ফুল গুলির চারি ধারে মধু লোভে ঘুরে বেড়ায়। ফুলের ফুটন্ত অবস্থাকে যদি ফুলের যৌবন বলা যায়, তাহা হইলে সেই সকল ফুল এখনও আমার ঘরে চির-যৌবন ল'য়ে বিরাজিত রয়েছে।

যে পথ দিয়ে দেশ দেখিতে বাহির হইতাম, প্রায়ই সে পথ দিয়ে আর ফিরিতাম না,—নূতন পথ দিয়া নূতন জিনিষ দেখিয়া ফিরিতাম। পূর্বোক্ত কাষ্ঠের প্রতিমূর্তি, পাতরের মন্দির ও কাগজের ফুল ইত্যাদি সওদা করিয়া ফিরিবার কালে চীনেম্যানদের নিজ দেশের আমোদ-আহ্লাদের জায়গা দেখিয়া ফিরিলাম। পাশ্চাত্য জীবনের অনুকরণে গঠিত নূতন সভ্যতার দেশ পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি স্থানের দৃশ্য হইতে এ সকল স্থানের দৃশ্যের অনেক প্রভেদ। এ দেশের গণিকাগণের স্পর্দ্ধা নাই। সাজগোজ করিয়া পথের ধারে দাঁড়ায় না। তাহাদিগকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দেওয়া চীনদেশের আইন বহির্ভূত বিধি,—দেশের নিয়মানুসারে দণ্ডনীয়। এমন কি তাহাদের বাড়ীতে তাহারা গৃহস্থদের মত কার্য্যে রত। কে যে কি তাহা বুঝা যায় না। তবে যে সন্ধ্যার পর চীনে গণিকাগণের জাহাজে যাওয়ার কথা লিখিয়াছি, সে বোধ হয় কেবল পেটের দায়ে অনন্যোপায় হইয়া চুরি-ডাকাতি করিতে বাহির হওয়ার মত।

সেখানে আহার করিবার, অহিফেণ-ধূম পান করিবার ও জুয়া খেলিবার দোকান খুব ঘন ঘন দেখা যায়; কিন্তু এময় সহরে একটি বই মদের দোকান দেখি নাই; এবং আর সকল দোকানে যেমন লোকের ভিড়, মদের দোকানে তার কিছুই নাই। ইহার কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহারা আফিং খায়, তাহারা মদ সহ্য করিতে পারে না।

তবে চীন দেশে যে সকলেই আফিং খায় এমন নহে। আমার বন্ধু স্থইচিনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের সংসারে কেহই আফিং খান না। তিনি আমাকে তাঁর আলাপী আরও অনেক চীনে পরিবারে লইয়া গিয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যেও কত লোক খায় না। তাঁহার ভাই পূর্ব্বে হংকং সহরের নিকটবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ম্যাকাউ নামক একটী স্থানে কুলি-সংগ্রহের কাজ করিতেন। সেখানে তিনি যত দিন ছিলেন, ততদিন আফিং ধূম পানে অভ্যস্ত ছিলেন। শুনিলাম কুলিদের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া অর্থনাশ ও সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাহাদের আফিং খাওয়া ও জুয়াখেলা শিখানর দরকার হইত—নয়ত নেশার ঝোঁকে ও দারুণ অর্থাভাবে সুদূর বিদেশে গিয়া চিরদাসত্বখতে তারা সই দিবে কেন। তাই তখন তিনি নিজেও খাইতেন! এখন দেশে ফিরিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চীনেদের ভিতরেও অনেকে আফিম্ সেবীকে ঘৃণা করে। চীন-সম্রাটও কতবার আফিম সেবনে দেশের লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আফিম সেবন বন্ধ করিবার জন্য চীনদেশে আফিম আমদানী রদ করিবার হুকুম জারী করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই ত ইংরেজ বাহাদুরের সহিত চীনের যুদ্ধ বাধে। ১৮৪০ সালে এই হাঙ্গামা হয়, ইহাকে "আফিম-যুদ্ধ" বলে ; কারণ ইংরাজ বাহাদুরের জোর করিয়া চীনকে আফিম ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার জন্যই এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াই, চীন ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ইংরাজদের হংকং দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ক্যাণ্টন, ন্যানকিন্, এময়, সাংহাই প্রভৃতি বন্দর ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবারিতদ্বার করিয়া দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে চীনদেশে অহিফেন সেবন প্রথা চলিত ছিল

না। ইহা সবে এক শত বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়াই চীন জাতিকে এত অধঃপতিত করিয়া ফেলিয়াছে। আগে আগে সকল আফিমই ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন চীন দেশেও বিস্তর আফিমের চাষ হয়। তবে জমির উর্ব্বরাশক্তি বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া চাষের উপযোগী অল্প জমিবিশিষ্ট চীন দেশের অনেক জমিদার নিজেদের ভূমিতে আফিম চাষ করিতে দেন না।

এই 'ম্যাকাউ' সম্বন্ধে দু'একটি কথা সংক্ষেপে বলি। এই ম্যাকাউর নির্জ্জন গিরি-গুহায় বসিয়া নির্ব্বাসিত পর্ত্তুগীজ কবি কেমোয়েন্ উচ্চ-আদর্শের পদ্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া এই ক্ষুদ্র স্থানটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জাহাজে যাত্রীদের পড়িবার জন্য যে সব পুস্তক রাখা হয় তার মধ্যে একখানি পুস্তকে এই সকল পদ্যের ইংরাজী তরজমা ছিল। কবির নিজ্জন-বাসে লিখিত সেই সকল মধুময়ী কবিতার বিষয় লিখিতে গেলে পুস্তক অনেক বড় হইবে। তবে একটু মাত্র না বলিয়া থাকিতে পারিব না। সে কবির কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিরর্থক ভ্রকুটীপূর্ণ সমাজ-বন্ধন অসহ্য মনে করিতেন; তাই তাঁহার হৃদয়ের কবিতা-ভাব-মাধুর্য্য এত বেশী ছিল যে, পড়িলেই মনে হয় যেন, তিনি প্রতি কথাই অন্তরের সহিত লিখিতেছেন। বিষয়—এক রাজপুত্র গুপ্তভাবে একটী নীচ বংশীয়া রমণীকে একান্ত প্রণয়ে বিবাহ করেন; রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বংশ-মর্য্যাদার হানি হইবার ভয়ে বিষপ্রয়োগে সেই রমণীকে হত্যা করেন। পরে যুবরাজ যখন রাজা হইলেন, তখন নিজ প্রণয়িনীকে গোর হইতে উঠাইয়া তাঁহার দেহে সুগন্ধ লেপন ও মহামূল্য রাণীর পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ স্থানে কবর দিলেন। অপূর্ণ সাধ মিটাইবার জন্য সে সমাধিস্থলও যেন কুঞ্জবন বা প্রমোদ-উদ্যানের মত সাজান হইল। লতা-মণ্ডপের ভিতর রাশি রাশি ফুল সুগন্ধ বিলায় আর পাখীরা বৃক্ষশাখে বসিয়া মধুর

বিষাদ সঙ্গিত গায়। শুনলে যেন পাথর ও গলে। এইরূপে সারা জীবন একনিষ্ঠ থাকিয়া তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সেই নির্জ্জন স্থানে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

এময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পোষ্টাপিস স্থাপিত করিয়াছে। চীন-সম্রাটের একটী, জাপানের একটী, ইংরাজের একটী, আমেরিকার একটী, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে ইউরোপীয় জাতিদের পরস্পরের কথাবার্ত্তার জন্য ইংরাজীই ব্যবহৃত হয়। তাহার একটী কারণ, আজ কাল সকল ব্যবসার স্থানে ইংরাজই প্রধান, আর একটি কারণ এই যে, এ সকল স্থানে আমেরিকার প্রতিপত্তিই বেশী, আবার তাহাদেরও ভাষা ইংরাজী।

হংকং ও এময়ে বিস্তর জাপানী দোকানদার আছে। চীনেম্যানরা বিলাতী জিনিষ বেচে; জাপানীরা নিজ দেশের শ্রমজাত দ্রব্যাদি বেচে। আজ ৪০ বৎসর ইউরোপীয়জাতির সহিত মিশিয়া জাপান উন্নতির শিখরে উঠিল, চীন পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিয়াছে। জাপানীদের ইংরাজী পোষাক-পরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দেখিতে মোটেই সুশ্রী নহে। চীনেম্যানরা তাহাদের সহিত তুলনায় অনেক ঢেঙা, অনেক ফরসা, অনেক সুশ্রী। তাহারা যেমন গম্ভীর প্রকৃতি, জাপানীরা তেমনি আমোদ-আহ্লাদ প্রিয়। দুইটী জাতিকে পাশাপাশি দেখিলে আকাশ-পাতাল তফাৎ মনে হয়। ইহারা কখনই দুইটি নিকট সম্পর্কীয় জাতি হইতে পারে না। বিশেষ দুইটী জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। জাপানী বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত ঘুড়ি-উড়ান প্রভৃতি আমোদে যোগ দেন, আর যে সে পুরুষের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না। কিন্তু চীনে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এময়ে আজ আমার শেষ দিন বলিয়া সারাদিন ঘুরিয়াছিলাম। ফিরে এসে সুইচিনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হ'চ্ছিল।

কথা শেষ হ'তে না হ'তে কিছুক্ষণ পরে সুইচিন আফিসের কোনও জরুরি কার্য্য বশতঃ চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কেবল মেয়েরা রহিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তো দোভাষীর সাহায্য ব্যতীত কথা কওয়া যায় না; তাই জানালার কাছে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে, চীন-ভাষায় লিখিত একখানি ছবির পুস্তকে ছবি দেখিতে লাগিলাম।

সমুদ্রতীরেই এই দোতালা বাড়ীটি অবস্থিত। জানালা হইতে সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য দেখা যাইতেছিল; নীল জলের উপর মেঘের মত কাল কাল পাহাড়। অতি দূরে প্রণালীর অপর প্রান্তে ইউরোপিয়ন এময় দ্বীপের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলির কতক অংশ দেখা যা'চ্ছিল। সমুদ্রের দিক হইতেই উন্মুক্ত নির্ম্মল শীতল হাওয়া আসিতেছিল। একান্ত মনে তাঁহাদেরই শান্তি-পূর্ণ সংসারের কথা ভাবিতেছিলাম। আর হয়ত ইহজন্মেও ইহাদের সঙ্গে দেখা হবে না।
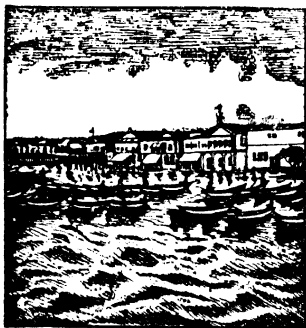
এময় বন্দর।

এমন সময় পাশের বাড়ি হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আসতে লাগল। একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া চীন-রমণী "গ্রামোফোন্" বাজাচ্ছিলেন। যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছিল না। তাঁহার কাল রেসমের পোষাক ও সাদা সাদা হাতগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। এক একখানি গান

সাঙ্গ হইলে গানের প্লেটগুলি নরম বুরুস্ দিয়ে সযত্নে মুছে যথাস্থানে রাখছিলেন। আর অমনি গান বেজে উ'ঠছিল। তার মধ্যে অনেক-গুলিই ইংরাজী গান ও কনসর্ট, কতকগুলি চীনে গানও ছিল। আমার সেইগুলিই ভাল লাগিল। ইংরাজী গানগুলি সব হাঁসি তামাসার সুর, চীনে গানগুলি সব কান্নার মত। অশরীরী বাক্, সুকৌশলে কখনও কাঁদলে কখনও হাসলে। যে দেশের খবর কেউ জানে না, সেই দেশের রহস্যকথা শুনালে। আমি তন্ময় হ'য়ে সব শুন্‌তে লাগলাম।

পূর্ব্বেই বলেছি, এ কয়দিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই, তার উপর সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কত স্থানে যাতায়াত করিয়াছি। একে অবসন্ন শরীর, তাহাতে ওরূপ অবস্থায় সহজেই ঘুম আসে। কখন যে ঘুমাইয়া পড়েছি তা মনে নাই। সে ঘুম স্বপ্নহীন ও অতি প্রগাঢ়। অমন ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নাই।

এক ঘণ্টা বাদে যখন জাগিলাম,—তখন দেখি, ঘুমন্ত অবস্থায় আমার গায়ে কে একখানি সুন্দর বালাপোস ঢাকা দিয়া দিয়াছে। পাছে ঘুম ভাঙ্গে তাই এত যত্নে এত সাবধানে দেওয়া যে আমি তা, মোটেই টের পাই নাই। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দররূপে ঢাকা ছিল বলিয়াই অমন প্রগাঢ় ঘুম হইয়াছিল। নয়ত, অত শীতে অমন হাওয়ায় অনাবৃত অবস্থায় ঘুমাইলে, হয় ঘুমের ব্যাঘাত হইত, নহিলে শরীর অসুস্থ হইত। কে যে তীক্ষ্ণ কল্পনার বলে আমার সে সময়কার অভাব জানিয়া, আমার অজ্ঞাতে সে অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তাহা মনে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম বলিয়া আর অনুসন্ধান করিলাম না। যাঁহারা দুগ্ধপোষ্য শিশু মানুষ করিতে জানেন, অভাব না জানাইতে পারিলেও যাঁহারা প্রকৃতিদত্ত তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন, কেবল তাঁহাদের দ্বারাই এরূপ কার্য্য সম্ভবে।

ভিন্ন দেশ ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্ম্ম ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহার

তবুও দুই দিন মাত্র কিছুক্ষণ করিয়া একত্র বাসের ফলে যে এত আত্মীয়তা জাগিতে পারে তা কখনও ভাবি নাই।

আজই আমার এখানে শেষ দিন। এই সকল অল্পদিনের বিদেশী বন্ধুদের সহিত আজই আমার শেষ দেখা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট অবধি আসিলেন। জাহাজে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নৌকা হইতে আর তীরের লোক চেনা গেল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িল। তখনও কিছু অন্ধকার ছিল। তখনও পশ্চিম আকাশে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। তখনও চীনে নাট্যশালার ক্ষীণ গীতধ্বনি থামে নাই। ক্রমে সে সুর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল তবুও একেবারে বিলীন হলোনা। মস্তিষ্কের ভিতর ধ্বনিত হইয়া যেন অনন্ত পথে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডের অপর প্রান্তে ওই ক্ষীণ তারাটির দীপ্তি-রেখার মত ; পরলোকগত প্রিয়জনের স্মৃতি-চিহ্নের মত।

সে সময়কার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ভাবুক কবি শেলীর এই কয়টি মধুর ছত্র আমার মনে হলো, —

"Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.
Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped forthe beloved's bed ;

অর্থাৎ—সঙ্গীত থামিয়া গেলেও তার সুর স্মৃতিপথে বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনিত হয়। ফুল শুকাইলেও তার সৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে লাগিয়া থাকে। পুষ্পের পরিণত অবস্থা আসিলে পাপড়ীগুলি গাছতলায় খসিয়া পড়িয়া যেন কোনও প্রিয়জনের শয্যা রচনা করে।

এত খানি বলিয়া মনের একান্ত আবেগে কবি আর থাকিতে পারিলেন না। জীবনের রহস্য কথা প্রকাশ হইল—অসংযুত লেখনী লিখিয়া ফেলিল—

And so thy thoughts when Thou art gone,
Love itself shall slumber on."

অর্থাৎ—সেইরূপ, হে হৃদয়ের ধন! যদিও তুমি চিরবিদায় লইয়া সুদূর লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছ, তোমার মধুর স্মৃতি এ অন্তরে চিরকালই বিরাজিত থাকিবে। শেলী কাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে এই শেষ কয়টি ছত্র লিখিয়াছিলেন, তা জানা নাই।

পরিশিষ্ট

যাইবার সময় দেখিবার যেখানে যা কিছু পারি দেখিয়াছিলাম। আসিবার সময় সেই সব ছবি অন্তশ্চক্ষুর সামনে উজ্জলতর হইয়া আসিত। যে সকল দৃশ্য বা ঘটনাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন সময়ে দেখিয়াছি সে গুলি পরস্পরের সহিত যথানিয়মে সম্বন্ধ হইয়া অভিনব ভাবে মনে জাগিত। প্রতিটি যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিশ্বরাজ্যের বা মানব প্রকৃতির নিগূঢ়তত্ত্ব কথা জানাইয়া দিত, মনে হতো যেন ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা সকল নিয়ম একই সূত্রে বাঁধা।

যে কারণে মানুষের উন্নতি অবনতি হয় সেই কারণেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি বা অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। চারিদিকের পরিবর্ত্তনের স্রোতের সহিত সমানে অগ্রসর হইতে না পারিলে স্থানচ্যুত হইতেই হইবে। তাই আসিয়ার জাতিসকল পরহস্তে স্বাধীনতা হারাইয়া অশেষ নির্যাতন সহিতেছে। যারা পূর্ব্ব হইতেই পরের করতলগত হইয়াছে তাদের আর আশা নাই। চীন জাপান এক কোনে পড়িয়া এখনও গ্রাসে আসে নাই। তাই জাপান সামলাইয়া লইয়াছে। চীন এখনও কত অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখন অবধি সাবধান হইবার বিশেষ চেষ্টাও নাই। আসিয়ার অন্যান্য দেশের মত প্রাচীন স্মৃতিতে বিভোর হইয়া এখনও নিরুদ্যম।

ভাগ্যচক্র যে আপনিই উঠে নাবে সে দৃষ্টান্ত হাজারেও একটা দেখা যায় না। যে উঠে সে আপনার চেষ্টাতেই উঠে। যে উন্নত সে সদাই সচেষ্ট। এত দেশের মধ্যে ধনধান্যপূর্ণ ব্রহ্মদেশেরই সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থা দেখিলাম। মলয় তো আরও নগন্য। চীনের শক্তি আছে কিন্তু বিকাশের চেষ্টা নাই। আর নিজের চেষ্টায় জাপান কত উন্নত।

ইউরোপের সহিত সংস্পর্শে এসিয়ার চোখ মিলিলেও দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। পলে পলে তার রুধির শোষিত হইতেছে। গাছ যেমন শিকড় বিস্তার করিয়া উর্ব্বরা ক্ষেত্র হইতে শত পথে সার রস শোষণ করে—রেল জলজান পথ ঘাট ও বিদেশীয় ব্যাবসাদি বিস্তারে আসিয়ারও সকল গুপ্ত সম্পদ তেমনি শোষিত হইয়া গেল। যে পথে গিয়াছিলাম তার যেথানেই চোখ মেলা যায় যে জিনিষেই নজর পড়ে, সবই বিদেশীয়। এমন শোষণে আর কতদিন বাঁচিবে। আমার মনে হতো ইউরোপের সহিত জীবন সংগ্রামে আসিয়ার সকল জাতিই পরিশেষে সমূলে ধ্বংশ হইবে।

এই গেল দেশ গুলির সামাজিক অবস্থার কথা; সাংসারিক অবস্থা যথা সম্ভব আমি আরও মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি। দেখিতাম প্রাচ্যজাতিরা সকলেই অল্পে তুষ্ট। তাদের সনাতন প্রকৃতি স্বভাবত পরস্বে লোলুপ নয়। কিন্তু নিজের অবস্থায় এত সন্তুষ্ট থাকাতেই তারা স্থানভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হইতেছে।

এ সকল দেশেই দেখিলাম সংসার লোকের জুড়াইবার স্থান। বাহিরের যত ক্লেশ যত নির্যাতন আপনার লোকের কাছে যাইয়া ভুলিয়া যায়। অতি অভাবেও একত্রে থাকিয়া সুখ বোধ করে।

সকল দেশেই শিশু পরম আদরের ধন। ভবিষ্যতে যারা বড় হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ দিজ দর্পে মেদিনী কাঁপাবে তারা কেমন অসহায় হয়ে আসে দেখ। আর স্ত্রী চরিত্রেরত কথাই নাই। সকল দেশেই মনে হতো পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও সদ্গুন দিয়ে তাঁহাদের প্রতি পরমানু গড়া।

সমাপ্ত।